অদ্ভুত আঁধার এক

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

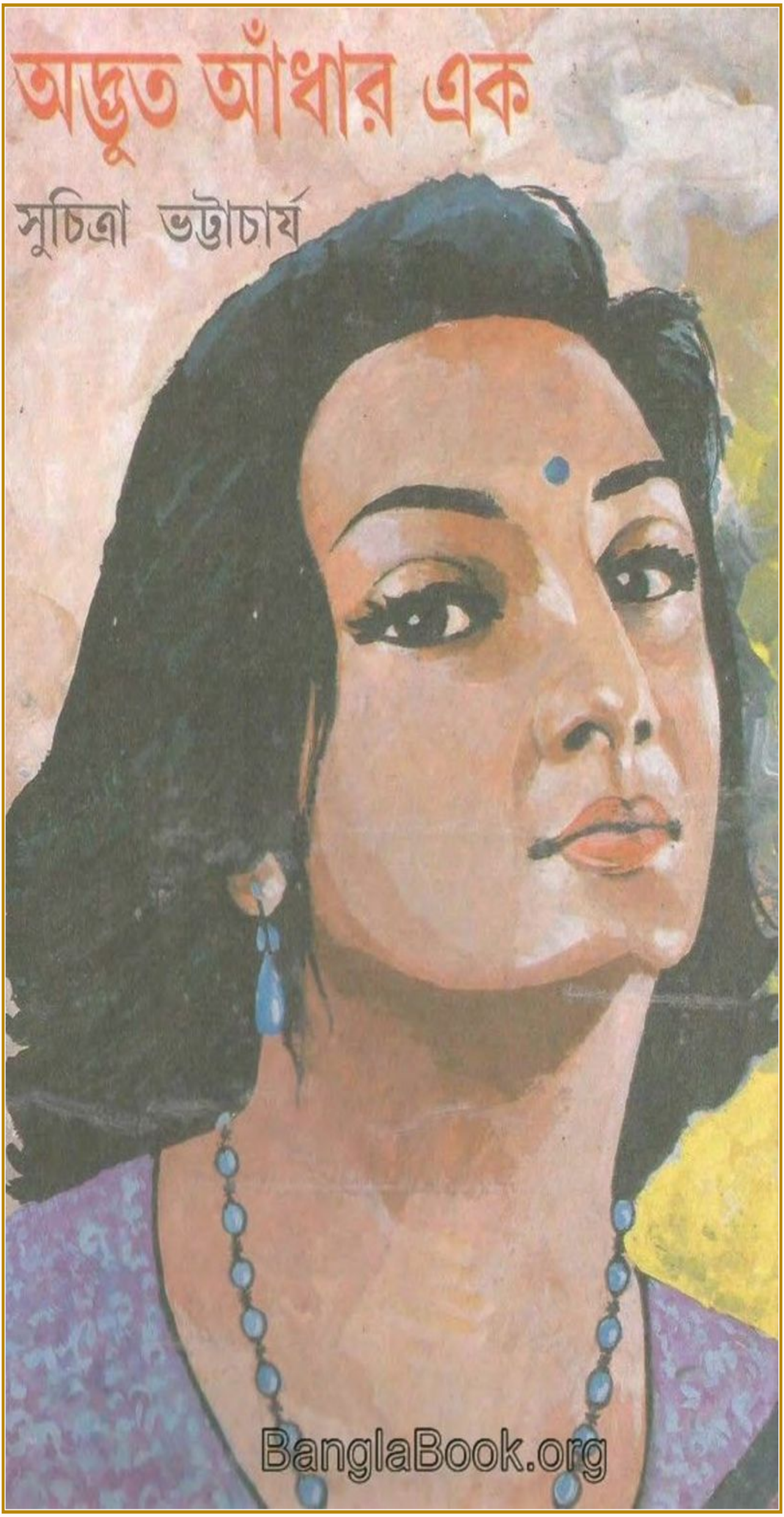

অদ্ভুত আঁধার এক

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books

৩০শে এপ্রিল রাত আটটা

দ্বিতীয় টিউশানটা সেরে বেরোনোর মুখে কালবৈশাখী এল। প্রথমে এক ঝলক হাওয়ার ঝাপটা। তারপর আরেক ঝলক। তারপরই দুরন্ত ঝড়ের ধাক্কায় একেবারে তোলপাড় চতুর্দিক। দরজা জানলা সব আর্তনাদ করে উঠল একসঙ্গে। দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডার খুলে পড়ল। টিঙ্কুর বইখাতারা নেচে উঠল ফড়ফড় করে। মুহূর্তে ঘর ধুলোয় ধুলোময়। মীরাবৌদি আসার আগে সুতপা দৌড়ে বন্ধ করতে গেল জানলাগুলোকে। বন্ধ কি করা যায়। একটা পাল্লা টানে তো অন্যটা ছিটকে যায়। ঝড়ের আচমকা হানায় দশদিক দিশাহারা। লাল আকাশ চিরে বিদ্যুৎ হেসে উঠল খিলখিল করে। গুড়গুড় মেঘ ডেকে উঠল। সামনের নিমগাছটা মাথা ঝাঁকাচ্ছে পাগলীর মত। এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে। ওপাশ থেকে এপাশে। গলির দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েও সুতপা দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। ঝোড়ো বাতাসের স্পর্শে গা শিরশির। ঝড় ব্যাপারটা এত সুন্দর তবু কেন যে এত ভয়ংকর। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের বাড়ি থেকে শাঁখ বেজে উঠেছে। পাশের বাড়ির নারকেল গাছ দুটো জিমন্যাস্টিক দেখিয়ে চলেছে অবিরাম। ঝড়ের পিঠে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে বড় বড় ফোঁটায়। সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটির বুক থেকে। টিঙ্কু হাততালি দিয়ে নেচে উঠল,—আয় বিষ্টি ঝেঁপে। মীরাবৌদি ঘরে এল। সব দিক সামলে সুমলে এসেছে মনে হয়। নিশ্চিন্ত করে বলল,—ব্যাস্, তুমি আটকে গেলে তো।

—তা গেলাম। কতদিন পর বৃষ্টি এলো বলুন তো।

—সত্যি। যা গরম যাচ্ছিল কদিন ধরে। ভালই হল। বোসো। বসে পড়ো। বৃষ্টি না থামলে তো আর···

—তা বলে আমি কিন্তু আর পড়াশুনো করব না। টিঙ্কু তাড়াতাড়ি গিয়ে বইখাতা গোছাতে শুরু করেছে। যত তাড়াতাড়ি তুলে ফেলা যায় আর কি।

সুতপা হেসে ফেলল,—এখন পড়তে হবে না। তবে অংকগুলো মনে করে বেশ করে রেখো। কাল ক্লাস টেস্ট আসতে পারে।

মীরা বৌদি ঠোঁট ওল্টালো,—তাহলেই হয়েছে। তুমি যতক্ষণ পড়াও ততক্ষণই যা পড়ে টড়ে। তারপর যেই বামুন গেল ঘর···

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝনঝন শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। বাজ নয়। কারুর বাড়ির টিনের চাল বোধহয় এসে পড়ল পাশের গলিতে। শব্দটা থেমে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ রেশ রেখে দিল।

মীরা বৌদির চোখ মুখে শংকা এল এতক্ষণে,—তোমার দাদা এসময় রাস্তায় টাস্তায় নেই তো! যা আলাভোলা মানুষ।

সুতপা ঘড়ি দেখল। আটটা দশ। টিঙ্কুর বাবা রাস্তায় আছে কি না কে জানে, তবে বাবুলকে নির্ঘাৎ এই জলঝড়েই রাস্তায় বেরোতে হয়েছে। সুতপাকে খুঁজতে। বাবা যা ব্যস্তবাগীশ। মা'র ওপর নিশ্চয়ই চোটপাট শুরু করে দিয়েছে এর মধ্যেই।

—এত টিউশনি করে বেড়ানোর কি আছে? আমি কি খেতে দিতে পারি না?

মা বলছে,—এত ভাবনার কি আছে? বৃষ্টিতে আটকে গেছে। থামলে ঠিক চলে আসবে।

—তুমি মেয়েটাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছ।

—আমি তুলছি? না তুমি?

বাড়ি ফিরে কপালে আজ দুঃখ আছে। সেই সাড়ে তিনটের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। শর্ট হ্যান্ড টাইপিং ক্লাস সেরে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যায় সন্তুকে পড়াতে। সেখান থেকে মিনিট দশেক হেঁটে এ বাড়ি। ঘন্টাখানেক করে পড়ালেও সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়। আজ সন্তুদের বাড়িতেই এত দেরি হয়ে গেল। বুলা বৌদি মানুষটা বড় অদ্ভুত। ছেলে বাড়ি নেই, বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছে, যাক না। সুতপা নয় একদিন নাই পড়াত। ঠিক কথায় কথায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আটকে রাখল,—এক্ষুনি এসে পড়বে। আরেকটু বোসো না।

তখনকার রাগটা নতুন করে ফুলে উঠল বুকের মধ্যে। ভারী তো পঁচাত্তরটা টাকা মাইনে দেয়। তায় রোজ পড়ানো। একদিন

কামাই করলে···। নাহ। এ মাসটা পড়িয়ে ওই টিউশনিটা ছেড়ে দেবে।

ঝড়ের দাপট কমে এবার জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কতক্ষণে থামবে কে জানে!

মীরা বৌদি জিজ্ঞাসা করল—এই সুতপা চা খাবে আরেকবার? করব? সঙ্গে মশলা দেওয়া পাঁপড়ভাজা?

সুতপা মাথা নাড়ল,—মন্দ হয় না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই টিউব-লাইটটা দপদপ করে উঠেছে। পাখাটা চলতে চলতে থমকাল একটু। আবার চলল। তারপর ঝুপ করে গোটা বাড়ি ঘোর অন্ধকার। যাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় লোডশেডিং নয় ওভারহেডের তার ছিঁড়ে পড়ল কোথাও। কথায় কথায় ছিঁড়ে পড়ছে। আর একবার ছিঁড়লে তো ব্যস। যতক্ষণ না সারায় অন্ধকারে ডুবে থাকো। গরমে মরো। একদিন হতে পারে। দুদিন। তিনদিনও। কেমন করে কাজ করে সব ভগবান জানে। আজ অবশ্য বড় অজুহাত আছে একটা। কালবৈশাখী।

☐ ৩০শে এপ্রিল রাত নটা ☐

পথ বেশি নয়। মুখার্জি পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই চৌধুরিবাগান রাস্তাও চেনা। মুখস্থ। তবু গা ছমছম করছিল সুতপার। পনেরো মিনিট টানা বৃষ্টিতে সব একেবারে ভিজে সপসপ করছে। রাস্তা ঘাট, গাছপালা। ঘরবাড়ি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'পাশের বাড়ি ঘরের জানলা খোলেনি এখনও। খুললেই বা আলো কোথায়। সুতপা শাড়ির কুঁচি আরেকটু তুলে নিল ওপরে। সাবধানে কাদা জল পার হল। বাঁ হাতে মীরা বৌদির দেওয়া টর্চটাকে জ্বালিয়ে রেখেছে। অর্ধেক পথ চলে এল প্রায়, এখনও একজন কি দুজন লোক চোখে পড়ল না। সাড়ে আটটার মধ্যে এদিকটা এত নির্জন হয়ে যায় না অন্যদিনই। নিদেনপক্ষে সন্ধের ট্রেনে কলকাতা থেকে চাকরি করে ফেরা মানুষগুলোকে তো দেখা যায়ই। গেল কোথায় সব! মীরা বৌদির কথা শুনলেই ভাল হত। টিঙ্কুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। বাবলুই বা তার খোঁজে আসছে না কেন! আরেক প্রস্থ কাদা পেরোনর সময় একটা

কোলা ব্যাঙ চলে গেল পায়ের ওপর দিয়ে। জারুল গাছের পাতা কাঁপিয়ে টুপটুপ কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল মাথায়। কপালে। সুতপা সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেল। জল কাদা মাড়িয়ে বেশ দ্রুত পা চালাল এবার। ছপাত ছপাত কাদা ছিটিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছে। আটটা পনেরোর ট্রেনটা শেয়ালদা থেকে এতক্ষণে পোঁছল বোধহয়। তীক্ষ্ণ হুইসলের ঝংকারে অন্ধকার কেঁপে উঠছে। আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই পেছনে কয়েকটা গলা শুনতে পেল। সুতপা কান খাড়া করল। দেখতে দেখতে দুটো সাইকেল এসে গেছে পেছনে। ঘুরে তাকাল সুতপা। চেনা চেনা লাগছে। ঘোলাটে অন্ধকার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। পাশে সরে যাওয়ার আগেই একটা সাইকেল গায়ের ওপর এসে পড়েছে।

—আরে তপু! তুই! কোথায় গিয়েছিল!

কাজলের মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুরভুর করে। সুতপা দুপা পিছিয়ে গেল। কী হয়ে গেছে কাজলদা। ছোটবেলায় কাজলদার সঙ্গে কী ভাবটাই ছিল। কত সরল ছিল তখন। সাধাসিধে। সুতপার বন্ধুর দাদা। সেই সুত্রে সুতপারও। এককালে নসিবুড়ির গাছ থেকে কত জামরুল চুরি করে এনে দিত। বুড়িবসন্তী খেলায় যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। খুকু বলতে লজ্জা করে না দাদা? মেয়েদের সঙ্গে এসে খেলিস? শুনে হাসত, খেলা খেলাই। মেয়েদের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গে কি? সেই ছেলে আচমকাই কেমন পাল্টে গেল। বড় হওয়ার পরই। ইদানীং নাকি খুব পার্টি ফার্টি করে। এ অঞ্চলের এম এল এ-র ডানহাত। লোকজনে বলে, ডানহাত না ছাই। আসলে পোষা গুন্ডা।

সুতপা আড়ষ্ট হল সামান্য।

—টিউশানি থেকে ফিরছিলাম। বাড়িতে এমন…

—কোথায় টিউশানি করিস?

—ওই তো, সাহেব বাগানের দিকে।

অন্য সাইকেলটা একটু দূরে দাঁড়িয়েছে। সওয়ারী দুজন। কাজল তাদের ডাকল।

—এদিকে আয়। আমাদের পাড়ার মেয়ে ; তপু। খুব ভাল মেয়ে। তোর নাম ভাল নাম সুতপা তাই নারে?

সঙ্গী দুজন কাদা মাড়িয়ে সামনে এল।

—আমার বন্ধু। পিঙ্কা। আর এ সুজয়।

সুতপা হাত জোড় করে নমস্কার করার চেষ্টা করল। দুটো হাত মিলল না ভালভাবে। সুজয় পিঙ্কার মুখ দিয়েও কটু গন্ধ বেরোচ্ছে। চোখগুলো ঢুলু ঢুলু।

কাজল হাত ধরে টানল,—আয়। বাড়ি যাবি তো ?

একবার এদিক ওদিক দেখে নিল সুতপা। ঠিক পেছনে নতুন একতলা বাড়ি উঠেছে একটা। সামনে রাঙচিতার বেড়া। সেই বাড়িটার জানলা থেকে কে যেন উঁকি মেরে দেখছে। আজকাল এদিকে যেখান সেখান প্রেম করার বহর খুব বেড়েছে। একটু অন্ধকার, একটু আড়াল আবডাল পেলেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় কপোত কপোতী। তাকে ওরকমই কিছু ভাবছে নাকি ! তাড়াতাড়ি রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল।

আগে আগে সুতপা হাঁটছে। পেছনে সাইকেল নিয়ে তিন আধা মাতাল। এ রাস্তাটা পার হলেই বড় রাস্তায় পড়বে। বড় রাস্তার ওপরে পুকুর বুজিয়ে নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে একটা। দেখতে দেখতে এমন একটা মফস্বলেও কতগুলো পাঁচতলা ছ'তলা উঠে গেল। কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় বলে আবাঙালিরাও ইদানীং ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। সুতপা আরেকটু গতি বাড়াল চলার। বড় রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই ডানদিকে শনিমন্দির। শনিমন্দিরের গা দিয়ে বাড়ির রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে সুতপা ওদের সঙ্গে দূরত্বটা বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। বড় রাস্তার কাছে আসতে এক আধজন মানুষ দেখা যাচ্ছে এবার। এক আধজনই। তারপর অন্ধকার রাস্তা নিঝুম আবার। জোরালো হেডলাইট জ্বেলে একটা বাস দৌড়ে গেল স্টেশনের দিকে। স্টেশনের দিক থেকেও বুড়ো শিবতলার দিকে গেল একটা। তাদের আলোয় মুহূর্তের জন্য আলোকিত রাস্তাঘাট। আবার যে আঁধার, সে আঁধার। সুতপা হাতের মুঠোয় টর্চটাকে চেপে ধরল শক্ত করে। লোডশেডিংয়েও এক ধরনের আবছা আলো থাকে পথেঘাটে। আজ যেন তাও নেই। আকাশ জুড়ে এখনও লাল মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। আরেকবার বৃষ্টি নামবে বোধহয়।

সর্বনাশটা ঘটে গেল বড় রাস্তাতেই। অর্ধেক তৈরি ইঁট কাঠ বার করা ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে এসে।

কাজল হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডেকেছে পেছন থেকে।

—এই তপু, দাঁড়া।

দাঁড়াবে না ভেবেও দাঁড়িয়ে পড়েছে সুতপা।

—আগে আগে হাঁটছিস কেন? আমাদের সঙ্গে হাঁটা যায় না?

সুতপা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

কাজল মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সাইকেল আড়াআড়ি ভাবে রেখে রাস্তা জুড়ে দিয়েছে।

—আমার সঙ্গে হাঁটতে ঘেন্না করে।

কাজলের মুখ চোখ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। এ কাজলকে একদম চেনে না সুতপা। উত্তর দিতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। সঠিক উত্তর এল না স্বরে।

—ঘেন্না করবে কেন?

—আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন আজকাল?

—তোমার সঙ্গে দেখা হয় কোথায়?

—এই তো হল। তবু কই…কথার ফাঁকে কাজল সুতপার আপাদ মস্তক দেখছে। বুকের কাছে এসে দৃষ্টি স্থির হল।

—বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছিস এখন। ছোটবেলায় একেবারে প্যাংলা ছিলি।

সুতপা আড়ষ্টভাবে আঁচল টানল বুকের। হাসার চেষ্টা করল। হাসি ঠিক ফুটল না।

—তুমিও অনেক অন্যরকম হয়ে গেছ কাজলদা।

—কিরকম?

—বুঝিয়ে বলতে পারব না। সুতপা কাজলের সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রাখল, চলো। মা বাবা আছে…

—না। এখন যাওয়া হবে না। কাজলের গলা নেশায় জড়িয়ে এল, বলতে হবে আমাকে কেন ঘেন্না করিস।

—বললাম তো করি না।

—আলবাৎ করিস।

সুতপার শরীর হিম হয়ে এল। নিজের অজান্তেই চোখ চলে

গেছে কাজলের বন্ধু দুজনের দিকে। অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে ছেলেদুটোর।

কাজলও ঘুরে তাদের দেখে নিল।

—ঘেন্না করিস না তো আয় দেখি।

—কোথায়?

—আয় না। তোর সঙ্গে বহুকাল পরে একটু গল্প গুজব করা যাক। ওখানটা গিয়ে বসি চল।

—না, কাজলদা, প্লীজ। সুতপা প্রাণপণ অনুনয় জানানোর চেষ্টা করল—আজ অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। বাবা মা খুব ভাবছে। তুমি বরং আমার সঙ্গে বাড়িতেই চলো না।

—চোপ। কোন কথা নয়। এবার কাজলের আগে কথা বলেছে কাজলের বন্ধু। বোধহয় পিংকা। হিংস্র আওয়াজের ধাক্কায় কালো নির্জনতা বুঝি ফালাফালা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন এসে হাত ধরে টেনেছে।

—আয় বলছি। ভ্যানতাড়া করিস না। এমন একটা বর্ষার রাত…চমচমে অন্ধকার…

—সামনে শালা এমন জেল্লাদার মাল…

পিংকা সুজয় দুজনেরই চোখ চকচক করে উঠল। ধারালো ছুরির ফলার মত। কাজল হাত রাখল পিঠে—আয়। ঝামেলা বাড়াস না।

বুড়োশিবতলার দিক থেকে দুটো সাইকেল রিক্সাকে আসতে দেখা যাচ্ছে। অতি মন্থর গতিতে। কাজলের হাত ছাড়িয়ে সুতপা দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সেদিকে। তার আগেই মুখ চেপে ধরেছে কাজল। চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতায় একটানে নিয়ে চলে গেল আধ তৈরি বাড়িটার সামনে। রিক্সাদুটো কাছে এসেও এল না। বেশ কিছুটা আগে ডানদিকে পরপর বেঁকে গেল। আলোহীন রাস্তায় কেউ আর নেই কাছাকাছি। তবু শেষবারের মত কাউকে একটা ডাকার চেষ্টা করল সুতপা। কেউ শুনতে পেল না সে ডাক। মুহূর্তের মধ্যে তিনজনে মিলে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঢুকিয়ে নিল বাড়িটাতে।

…ইট্‌স্ আ কেস অফ গ্যাংরেপিং উইথ সিভিয়া ইনজুরিজ অন প্রাইভেট পার্টস…দা পেশেন্ট ওয়াজ ব্রট টু এমারজেন্সি অ্যাবাউট টেন থার্টি পি এম ইন আ সেমি কনশাস কন্ডিশন উইথ ডিপ মেন্টাল শক অ্যান্ড ইনজুরিজ অন হার বডি…অন এপ্রিল।

রীতিমত চিৎকার করে মেডিকাল রিপোর্ট পড়ছে ডিউটি অফিসার। অত জোরে পড়ার দরকার নেই তবুও। পড়তে পড়তে অন্য টেবিলে বসা মেজ দারোগার দিকে তাকাল।

—আবার একটা কেস ঘোষালদা। দুমাসের মধ্যে। অ্যানাদার কেস অফ মাসরেপিং।

রিপোর্টটা শোনার সময়ই মেজ দারোগা নড়ে চড়ে বসেছিল। এবার টানটান হল।

—কোন জায়গায় হল ?

—বলছে তো স্টেশন রোডের ওপরেই।

—লিখে নে।

পুরোন আমলের কড়িবরগাঅলা বড় সড় ঘরে গোটাচারেক লণ্ঠন জ্বলছে। জানলাগুলো সব তারজালে ঘেরা। সেই জালের ওপর এলোমেলো আলো পড়ে ভুতুড়ে ছায়া তৈরি হয়েছে কয়েকটা। প্রিয়ব্রত ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছেন সেদিকে। ডিউটি অফিসার তাঁর দিকে তাকাল এতক্ষণে,

—আপনার মেয়ে ?

শুনেও শুনতে পেলেন না প্রিয়ব্রত। তাঁর হয়ে অনুতোষ উত্তর করলেন,

—হ্যাঁ স্যার। এনারই মেয়ে।

—আর এরা ?

—এটি এনার ছেলে। এরা দুজন ওরই বন্ধু। পাড়ারই।

ডিউটি অফিসারের জটিল চোখ বাবলুকে ছুঁয়ে অন্য দুজনকে জরিপ করল ভালভাবে। দৃষ্টি দেখে মনে হয় অপরাধীদের দেখা মাত্র চিনে ফেলেছে। বাবলু চোখ বন্ধ করে ফেলল। দিদির এখনও জ্ঞান ফেরেনি ভালভাবে। হাসপাতালের বেডে যন্ত্রণায় ছটফট

করছে।

ভানু নোটনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডিউটি অফিসার বাবলুর দিকে তাকাল।

—তুমিই তাহলে প্রথমে দেখতে পেয়েছ বলছ?

দাঁতের ঠোঁট চেপে বাবলু মাথা নাড়ল।

—কি নাম তোমার?

—বাবলু, সুমন, সুমন বসু।

—আর কে ছিল তোমার সঙ্গে।

বাবলু নোটনের দিকে তাকাল। নোটন নিজেই বলে উঠেছে,

—আমি। আমি স্যার।

—তোমার কি নাম?

—নোটন হালদার।

—ওখানে তোমরা কি করতে গিয়েছিলে?

অদ্ভুত প্রশ্ন। নোটনের স্বর হোঁচট খেয়ে গেল,

—মানে স্যার…

—বলো। বলে ফ্যালো। ওখানে তোমরা কি করছিলে?

বলার ভঙ্গিতে বিশ্রী ইঙ্গিত যেন। বাবলুর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কি বলতে চায় লোকটা? নোটনকে থামিয়ে স্পষ্ট গলায় বাবলু কথা বলল এবার,

—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

—কি দেখলে?

চোখের সামনে দৃশ্যটা আবার ভেসে উঠল নতুন রূপে। সে দৃশ্যের বর্ণনা কোনদিন আর কাউকেই দিতে পারবে না বাবলু। দৃশ্য নয়, দুঃস্বপ্ন। সারাজীবনের মত গেঁথে গেছে বাবলুর বুকে।

বৃষ্টি থামার পর দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। একটু বিরক্ত হয়েই। মা বাবা আজকাল অল্পতেই এত বেশি চিন্তা শুরু করে।

গলির মুখে দেখা হয়ে গেল নোটনের সঙ্গে,

—কি রে কোথায় চললি?

—আর বলিস না। দিদিটা এখনও বাড়ি ফেরেনি। জলঝড়ে কোথাও আটকে গেছে বোধহয়। এদিকে বাবা জোর টেনশন শুরু

করে দিয়েছে। মহারানীকে এখন এসকর্ট করে নিয়ে আসতে হবে।

—তোরই বা একটু এগিয়ে দেখতে অসুবিধে কোথায়?

—যাচ্ছি তো।

চল। আমিও যাই।

নোটন সঙ্গী হল বাবলুর। দুজনে বড় রাস্তায় উঠল। আলো না থাকলে এত বড় রাস্তাটাও কেমন ভূতের মত হয়ে যায়। শনিমন্দিরের পাশে হরিপদদার দোকানে টিমটিম টেমি জ্বলছে। উল্টোদিকে কাপড়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাইকেল সারানোর দোকানটাও। একটু হেঁটে পান দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনল নোটন। নতুন সিগারেট খাওয়া ধরেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর। নিজেরটা ধরিয়ে বাবলুর দিকে বাড়াল,

—নে। ধর।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই টান দিতে লাগল দুজনে। এদিক ওদিকে চোখ। চেনা লোক দেখলেই লুকিয়ে ফেলবে। শুক্লাদি আর শুক্লাদির বর ফিরল কোত্থেকে। অর্ধেক খেয়ে সিগারেট নিভিয়ে দিল বাবলু। রেখে দে। ভাল্লাগছে না আর।

নোটন চোখ টিপল—ভাল্লাগছে না? না ভয়? তপুদি এসে পড়বে।

—ধুস। ওকে কিসের ভয়। আই ডোন্ট কেয়ার। চল। একটু চা খাওয়া যাক।

—তপুদিকে খুঁজতে যাবি না?

—খোঁজার কি আছে? কচি খুকি নাকি? ঠিক টাইমলি এসে যাবে।

এভাবেই চা সিগারেটে সময় গেল বেশ খানিকক্ষণ। তখনও বাবলু ভাবতে পারেনি কত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ওই বড় রাস্তার ওপরেই। না মেজদার দোকান থেকে বেরোবার পরেও না। তখনও ভাবছিল চৌধুরির বাগান দিয়ে যদি শর্ট কার্ট করে দিদি, তবে লাগবে পনের মিনিট বড় রাস্তা দিয়ে এলে সময় বেশি লাগে। জল কাদার মধ্যে কি আর চৌধুরির বাগান দিয়ে আসবে? দিদি যথেষ্ট চালাক চতুর। ওরকম বোকামি করবে না।

মেজদার দোকান থেকে বেরিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই হাঁটছিল

ওরা।

—হ্যাঁরে, এর মধ্যে পাস করে যায় নি তো।

—নাহ। আমি নজর রেখেছিলাম।

নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটা যেখানে তৈরি হচ্ছে তার আশপাশ এখনও বেশ ফাঁকা। অনেকটা মাঠ পড়ে আছে। দিব্যেন্দু সরকারের বাড়ির পাশে জমি কিনেছে দিদিদের কলেজের এক প্রফেসর। তার পাশে ভিত অবধি তুলে ফেলে রেখেছে বাজারের নটে মুখুজ্যে। তার পরেই দাঁত বার করা ফ্ল্যাটবাড়ির খাঁচা। ঠিক যেখানটায় বাড়িটা উঠেছে তার সামনে ঢালমতন আছে অল্প। ওখানে কেউ শুয়ে বসে থাকলে সহজে চোখে পড়ে না। বাবলুদেরও পড়েনি। বাড়িটা পেরিয়ে যাওয়ার পর মনে হল কেউ যেন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠতে চাইছে। কে ওখানে! কি হয়েছে! কি করছে অত রাতে। সামনে এগিয়ে দেখতে গিয়ে বাবলু পাথর।

দিদি!

নোটন দৌড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সুতপার শরীরে শাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। ব্লাউজ ছেঁড়া। নোংরা কাদায় চোখ মুখ এমন মাখামাখি যে অন্য কেউ দেখলে চিনতে পারত না।

—অ্যাই দিদি? কি হয়েছে তোর? অ্যাই দিদি?

সুতপা বার কয়েক চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল। হাত বাড়িয়ে বলতেও চাইল কিছু। কিছুই বোঝা গেল না। গলা দিয়ে উদ্ভট গোঁ গোঁ শব্দ বার হল মাত্র। ঠোঁট, গাল, কপাল, চিবুক সব একসঙ্গে কেঁপে উঠল থরথর করে। জল থেকে তোলা মাছের মত কাদায় আছাড় খেলে দুতিন বার। তারপর বাবলুর হাতের ওপরই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাবলু দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ডিউটি অফিসার খাতায় খসখস করে কিছু লিখে চলেছে। শেষ করে আবার প্রশ্ন করল,

—কি দেখলে বলো?

বাবলু ঢোক গিলল। বলতে গিয়ে স্বর দুলে গেল ভীষণভাবে,

—দিদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—বাড়িটার ভেতরে? না বাইরে?

—বাইরে।

আবার কিছু লিখল ভদ্রলোক। মেডিকেল রিপোর্টে নতুন করে চোখ বোলাল,

—তোমার দিদিকে কি প্রায়ই খুঁজতে বেরোতে হয় ?

—না। আজ বৃষ্টির জন্য দিদির দেরি হচ্ছিল।

—রোজই তোমার দিদি সন্ধের পর বাইরে থাকে ? এরকম ?

—দিদি পড়াতে যায়।

—আজ পড়াতে গিয়েছিল কিনা তুমি সিওর ?

বাবলুর গলা শক্ত হল এবার, হ্যাঁ। আমার দিদি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর মেয়ে নয়।

ডিউটি অফিসারের ঠোঁটে এক ফালি বাঁকা হাসি দেখা দিল। বাবলুর দুহাত নিজের অজান্তে মুঠো হয়ে গেছে। লোকটা অকারণে উল্টো পাল্টা জেরা করে চলেছে। কঠিন একটা উত্তর এসে গিয়েছিল মুখে, অনুতোষ কাকা তার আগেই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেছেন,

—শী হ্যাজ বিন রেপড স্যার। ব্রুটালি।

—জানি। আপনাদের সকলকে আলাদা আলাদা স্টেটমেন্ট দিতে হবে।

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন প্রিয়ব্রত। এখনও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মানুষ। কটা বাজে এখন ? অনুতোষ ঘড়ি দেখলেন। মাথার সামনে বড় দেওয়াল ঘড়িতে পুরো পৌনে একটা। হাসপাতাল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অত রাত্তিরে কোত্থেকে দুটো বছর পঁচিশের ছেলেকে ধরে নিয়ে এল মেজ দারোগা। গম্ভীর মেজাজে কনস্টেবলদের হুকুম দিল, পুরে রাখ ভেতরে। শালা। পাতা খাওয়া পার্টি সব। সকালে বাড়ির লোক এলে আমায় ডাকাব। আমি না আসা পর্যন্ত—

লোক দুটোর চেহারা সিড়িঙ্গে টাইপের। চোখ গর্তে ঢোকা। জুলজুল করে তাকাচ্ছে চারদিকে। তাকানোই। দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই। প্যান্ট শার্ট মোটামুটি চকচকে। দামী। কারা এরা। কোত্থেকে এল। এরা কি তাঁরই ছাত্র ছিল কোনদিন ! ইদানীং

এসবের বহর খুব বেড়েছে এদিকে। বছর দশেক আগে বড় বড় দুটো কারখানা বসার পর থেকেই হু হু করে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। নতুন মুখ। বাজারে গেলে অনেককে চিনতে পারেন না অনুতোষ। সময় কি দ্রুত এগিয়ে যায়। গুণ্ডা মস্তানদের সংখ্যাও বাড়ছে দিনে দিনে। ছিনতাই পার্টি। ওয়াগন ব্রেকার। গত বছর ইলেকশনের আগে চার পাঁচটা খুনই হয়ে গেল। রাজনীতির জমি দখল। কত ভদ্র ছেলে আস্তে আস্তে কোথায় নেমে গেছে। এই তো বিপিনবাবুর ছেলেটা···। অনুতোষের মাথায় চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দু হাতে রোজগার করছে আজকাল। বাড়ির হাল ফিরে গেছে। গায়ে রঙ চড়েছে। পাশ দিয়ে গেলে সারা দিন রাত হিন্দি ফিল্মের শব্দ শোনা যায়। উদ্দাম। ছেলের এখন মস্তান হিসেবে রামনগরে খুব নাম ডাক। গোটা অঞ্চলের লোক মান্যগণ্য করে। ভয়ে। আতঙ্কে। ক্ষমতায় দাপট দেখে। বিপিনবাবুও আর সে বিপিনবাবু নেই। যে লোকটা এককালে বিপ্লবী ছিলেন, সরকারের দেওয়া তাম্রপত্র ফিরিয়ে দিতে যাঁর হাত কাঁপেনি, সেই লোকটা কেমন কুঁজো হয়ে গেছেন। লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না। দেখা হলে কথাবার্তা বিশেষ বলতে চান না। এড়িয়ে যান। প্রিয়ব্রতর মেয়েটাকে বিপিনবাবুর ছেলের কাজল কি···। অনুতোষের মাথা গুলিয়ে যেতে শুরু করল। ডিউটি অফিসার আবার এক মনে কি লিখে যাচ্ছে। মেজ দারোগা ইউনিফর্ম ছেড়ে লুঙ্গি পরে বসেছে এসে নিজের চেয়ারে। গেঞ্জির ভেতর দিয়ে রুল চালিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে। ঘসে ঘসে। দরজার ঠিক গোড়ায় সেন্ট্রিটা ঝিমোচ্ছে টুলে বসে। থানাতেও রাত নেমেছে। কালবৈশাখী বয়ে যাওয়ার পরের ঠাণ্ডা রাত। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যাওয়া অন্ধকার রাত।

লেখা শেষ করে ডিউটি অফিসার প্রিয়ব্রতর দিকে তাকাল। গলার স্বর আচমকা নরম করে ফেলেছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে এতক্ষণ পর বুঝি মায়া এসেছে মনে।

—এবারে যে স্যার আপনাকে একটু···

প্রিয়ব্রত যেন অনেক কষ্টে ঘাড় তুললেন। হাসপাতালে কান্নাকাটি করেছেন খুব। এখনও চোখ লাল।

—আপনার নাম ?

—প্রিয়ব্রত বসু।

—বাবার নাম ?

স্বর্গীয় লালমোহন বসু।

—ঠিকানা ?

—সুভাষ পল্লী।

কি করেন আপনি ?

চাকরি। প্রাইভেট কোম্পানীতে। কটা নাগাদ আপনি খবর পান ? কার কাছে ?

প্রিয়ব্রত ঢোক গিললেন। কান্না চাপার চেষ্টা করছেন। ফ্যালফ্যাল করে নোটনের দিকে তাকালেন।

নোটন বলে উঠল,—আমরা তপাদিকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার সময় ভানুকে খবর দিয়ে যাই। ভানুই মেসোমশাইকে নিয়ে হাসপাতালে—

—তুমি চুপ করো। ডিউটি অফিসারের গলা রূঢ় হল আবার,—যা বলার উনিই বলতে পারবেন। বলেই গলাটাকে পোষ মানিয়ে নিয়েছেন,

—আপনার মেয়ের কি কারুর সঙ্গে ভাবসাব ছিল ? মানে কোন অ্যাফেয়ার ?

প্রিয়ব্রত দুদিকে মাথা নাড়লেন।

—আপনি সিওর ?

এবার বেশ অসহায় বোধ করলেন প্রিয়ব্রত। অনুভার্গ তাঁর পিঠে হাত রাখলেন। মনে মনে বিরক্ত হলেন। এই মুহূর্তে মানুষটাকে এসব প্রশ্ন না করলেই কি নয়।

—কাউকে সাসপেক্ট করেন আপনি ?

প্রিয়ব্রত আবারও দুদিকে মাথা নাড়লেন। ধরা গলায় বললেন,—মেয়েটা জন্মেছে এখানে। বড় হয়েছে এখানে। সবার সঙ্গে চেনাজানা, মেলামেশা। কাকে সাসপেক্ট করব ? বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন। [illegible] সঙ্গে সঙ্গে তার দুকাঁধ চেপে ধরেছে। বাইরে থেকে একটা কনেস্টেবল এসে জানান দিল,—বড়বাবু

আসছেন কোয়ার্টার থেকে।

মুহূর্তে ডিউটি অফিসার সচকিত। মেজবাবুও নড়েচড়ে বসেছে সামান্য। কালো প্যান্টের ওপর নীল বুশ শার্ট চড়িয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। চোখ দেখে মনে হয় ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়েছে। ঘরে ঢুকে অনুতোষদের এক ঝলক দেখে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। গিয়েই বেল বাজিয়েছেন। ডিউটি অফিসার উঠে গেলে মেজ দারোগার ডাকে পেছন ফিরলেন অনুতোষ।

—আপনি কে হন ? ওনার ?

—পুরোন বন্ধু। প্রতিবেশী।

—আপনি আদর্শ বিদ্যাপীঠে পড়ান না ?

অনুতোষ বেশ অবাক হলেন। পুলিশ দারোগারা বোধহয় সব খবর রাখে। প্রশ্ন করেই আড়মোড়া ভাঙল বড় করে,

—দেখুন আপনারই কোন ছাত্র…

কি ইঙ্গিত করতে চায় লোকটা ? অনুতোষ বেশ আহত বোধ করলেন। এই তো ভানু, নোটন, বাবলু এরাও তাঁর ছাত্র। এদেরই মত কেউ…। ভাবতেও নিজের ওপর ঘৃণা আসে। দু আঙুলে কপাল টিপে ধরেন।

ভানু নোটন আর বাবলু দেওয়ালের গায়ে রাখা খালি বেঞ্চটাতে বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্লান্তি আসছে অনুতোষেরও। কতক্ষণে এখান থেকে বেরোন যাবে কে জানে !

ডিউটি অফিসার ওসির ঘরের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল,

—আসুন আপনারা। স্যার ডাকছেন ভেতরে।

ওসির টেবিলের পেছনে ব্ল্যাক বোর্ড টাঙানো একটা। চক দিয়ে ঘর কেটে বিভিন্ন রকম অপরাধের পরিসংখ্যান লেখা সেখানে। গোটা বছরের সালতামামি। টেবিলে কাচের নিচে বিশাল মা কালীর ছবি। ছবি ঘিরে অজস্র ভিজিটিং কার্ড। দেওয়ালে দামী বিদেশী ক্যালেন্ডার ঝুলছে। টেলিফোন রাখবার বাক্সটার গায়ে এক দাড়িওলা সন্ন্যাসীর ছবি। কনস্টেবল ঢুকে আরও একটা হ্যারিকেন রেখে গেল।

প্রিয়ব্রতদের হাত দেখিয়ে চেয়ারে বসতে বললেন ভদ্রলোক,

আপনার মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে ?

প্রিয়ব্রত এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে। নিচু স্বরে উত্তর দিলেন,

—ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে।

—ঠিক আছে। কাল আমি নিজে হাসপাতালে যাব। নিজে শব্দটার ওপরে জোর দিলেন ভদ্রলোক,—আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনুতোষ বলে উঠলেন—বদমাইশগুলো ধরা না পড়া পর্যন্ত···

—কিছু ভাববেন না। ধরা পড়বেই। পালাবে কোথায় ? বলতে বলতে উদাস হয়েছেন—আসলে কি জানেন তো। চারদিকে এত ইণ্ডাস্ট্রি ফিণ্ডাস্ট্রি গজিয়ে উঠেছে আর এসব বদমাইসও বাড়ছে। এই তো ফেব্রুয়ারিতে যে কেসটা হয়ে গেল। মেয়েটার চালচলন অবশ্য খুব ভাল ছিল না···। প্রোভোকেটিভ। পোশাক আশাক যা পরত। সেই ছেলেগুলোকে তো চালান করে দিয়েছি।

প্রিয়ব্রত বলতে গেলেন—আমার মেয়ে তো সেরকম···

ওসি থামিয়ে দিলেন—না, না। আমি তা বলিনি আপনারা স্টেটমেন্টগুলো সব সই করে বাড়ি চলে যান। কাল সকালে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কাজ সব সেরে বেরোতে বেরোতে দুটো বাজল। থানার সেন্ট্রি লম্বা বারান্দায় ঘণ্টাটাকে বাজাল ঢং ঢং। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আবার। বাবলু নর্দমার ধারে গিয়ে হুড় হুড় করে বমি করে ফেলল। নোটন ভানু দৌড়ে গিয়ে ধরেছে তাকে। সামনের টিউবওয়েলের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মাথা ধুইয়ে দিল ভাল করে। প্রিয়ব্রতর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। অনুতোষের হাত খামচে ধরলেন। আকস্মিক ভাবে স্ত্রীর মুখটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কোন মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন এখন বাবলুর মার সামনে ? এতদিনকার নিশ্চিন্ত সংসার···ছেলে··মেয়ে···। গোটা পৃথিবী দুলতে শুরু করেছে। মস্তিষ্কের অবশ ভাব কেটে এখন শুধুই তোলপাড়। হাঁটু দুটো ক্রমে আরও দুর্বল হয়ে গেল। ভেজা রাস্তার বুকে উবু হয়ে বসে পড়লেন প্রিয়ব্রত।

বিকেলে হাসপাতালে এসে খবর পেলেন প্রিয়ব্রত, শোভনা। ও সি কথা রেখেছেন। নিজেই এসেছিলেন সকালে।

দোতলায়, এমারজেন্সি ওয়ার্ডের একেবারে শেষ বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুতপা। জানলার দিকে মুখ। শোভনা প্রায় উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে গেলেন মেয়ের কাছে। কাল থেকেই মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সকালেও হাসপাতালে আসতে চেয়েছেন। বাবলু আসতে দেয়নি। প্রিয়ব্রতকেও না।

—তোমরা এখন আর গিয়ে কি করবে? ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া কাছে গিয়ে বসতেও পারবে না। তাছাড়া আমি তো খোঁজ নিয়ে এলাম। দিদি অনেকটা ভাল আছে এখন।

মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বাবলু যেন কত বড় হয়ে গেছে। ষোল বছরের কিশোর হঠাৎই এক রাতে প্রাজ্ঞ যুবক। সকাল থেকে সামাল দিচ্ছে সবদিক। বাড়িতেও তো লোক আসার বিরাম নেই। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই একবার করে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যে কোনদিন বাড়িতে আসে না সেও। সান্ত্বনা আর আফশোসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে হাজার পরামর্শ। অযাচিত বুদ্ধি দান। অকারণ কৌতূহল।

—অমন সুন্দর মেয়েটার কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল…

—আহা, কি হাসিখুশি ছিল মেয়েটা…। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে… কি যে হবে এখন?

—ওকে ওরকম সন্ধেবেলা টিউশনি করতে যেতে দিতেন কেন দিদি? জানেনই তো কী দিন কাল…।

—হায়। হায়। অত বুদ্ধিমতী হয়েও তপু এমন ভুলটা করল কি করে? ওইরকম অন্ধকারে ঝিলব্রিজ মাথায় একা একা ফেরার সাহস করতে আছে?

—কজন মিলে কাজটা করেছে কিছু বোঝা গেল?

—এসব হল বেশী হিন্দী সিনেমা দেখার ফল। আজকাল তো ভায়োলেন্স রেপ ছাড়া ফিল্মই হয় না।

—যা বলেছেন। ছেলেদের মাথা ঘোরে আর না ঘোরে···

এখনও তাও আত্মীয়-স্বজনরা জানতে বাকি আছে। তারা এসে আরও কি বলে। সকলেরই কথার ভাবে মনে হয় দোষের ভাগী সুতপাও কিছুটা। দোষ সন্ধ্যেবেলা টিউশনি করতে যাওয়ার। দোষ একা একা বাড়ি ফেরার। দোষ হিন্দি সিনেমার। কেউ একবারও বলছে না একটা সভ্য দেশে কেন একটা মেয়ের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার থাকবে না। মনে হয় এটাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম। পুরুষের সমাজে পাশবিক হয়ে ওঠার অধিকার একমাত্র পুরুষেরই আছে। মেয়েরা তো শুধুই ভোগের জন্য। কলঙ্কিত হওয়ার জন্য। সিনেমা থিয়েটারের উত্তেজক দৃশ্য মানুষের প্রথম রিপুটাকে তাতিয়ে তুলতেই পারে। সেই কারণেই শুধু পশুর থেকেও পাশবিক হয়ে উঠতে পারে মানুষ।

না। কেউ চিন্তা করে দেখছে না সেভাবে। প্রিয়ব্রতও না। বাবলুও না। প্রিয়ব্রত শুধুই ভেতরে ভেতরে ভাঙছেন আরও। বাবলু ক্ষুব্ধ। আহত। একমাত্র শোভনাই লক্ষ প্রশ্নের ঝাপটায় বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন। সেই কাল রাত থেকেই। প্রবল বন্যার তোড়ে ভেসে যাচ্ছেন অসহায়। প্রথমটায় শোনার পর মাথা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তপুকে নয়, কেউ যেন তাঁকেই পিষে থেঁতলে চলে গেল। এরপর মেয়ের বিয়ে দেবেন কি ভাবে? কি ভবিষ্যৎ নিয়ে বাঁচবে মেয়েটা? কাল অনেক রাত পর্যন্ত অনুতোষবাবুর স্ত্রী ছিলেন পাশে। অনুতোষবাবুর মেয়ে ঝর্ণাও। ঝর্ণা কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। শোভনা নিশ্চল বসেছিলেন। কোন দোষে এত বড় শাস্তি পেল তপু? আর কি কোনদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে? এ সময় মেয়েটার পাশে থাকতে পারলে ভাল হত। তপুর এখন মাকেই দরকার বেশি। যত ভেবেছেন উদভ্রান্ত হয়েছেন তত। ছটফট করে মরেছেন।

মেয়ের পায়ের দিকে খাটের রেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিয়ব্রত। শোভনা হাত রাখলেন মেয়ের গায়ে। মেয়ে কেঁপে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে। কেঁপেই স্থির হয়েছে।

লম্বা টানা ওয়ার্ডের সব কটা বিছানাতেই রুগী। নানান বয়সের। মাটিতেও তোষক-কম্বল পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে অনেককে। সকলের কাছেই বাড়ির লোক আসতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ক্রমে ভিড় বাড়ছে। গুনগুন শব্দ ভাসছে গোটা হল ঘরটা জুড়ে।

শোভনা খুব আস্তে ডাকলেন,

—তপুউ···তপু···

সুতপা ফিরল না। জানলার বাইরে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে সেদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। বোবা, ভাবহীন দৃষ্টি। কাল রাতের পর থেকে একটুও কাঁদতে পারেননি শোভনা। এখন হঠাৎ দুচোখ ভিজে গেল। স্বামীর দিকে তাকালেন। কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনিও। হু হু করে চোখ বেয়ে কিছু ঝাপসা ছবি ভেসে গেল···

···তীব্র যন্ত্রণায় হাসপাতালে ছটফট করছেন শোভনা। প্রথম সন্তান আসছে। গর্ভ ছিঁড়ে। গোটা শরীর তোলপাড় করে। দুদিন, তিন রাত ধরে সে কী অসহ্য যন্ত্রণা। একসময় বিচ্ছিন্ন হল শরীর থেকে। শালিখ ছানার মত এতটুকুন। লালচে রঙের। মাথায় শুঁয়ো শুঁয়ো চুল। আধফোটা চোখ। এত ছোট যে প্রিয়ব্রত কোলে নিতে ভয় পেতেন। শোভনাও কি পারেন ভালভাবে সামলাতে! মাঝে মাঝেই ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠছে শালিকছানা। শোভনা কোলে তুলে দুধ খাওয়াচ্ছেন। আনাড়ি মায়ের মত। মা হাঁ হাঁ করে উঠল দেখে,—ওভাবে নয় রে বোকা। ওভাবে চেপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে। দুই স্তন কটকট করে উঠল। অদ্ভুত এক অচেনা যন্ত্রণা। এক বুকে শিশুর মুখ রাখলে অন্য বুক ভেসে যায় দুধে। দুধ? না রক্ত? রক্তই কি দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে।

···দৃশ্য বদলে গেল। বাপের বাড়ির থেকে তিন মাসের মেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন শোভনা। শালিখছানা প্রতিদিন একটু করে বড় হচ্ছে। আধনাড়া মাথায় চুল গজালো। পাতলা পাতলা। নরম নরম। দেখতে দেখতে গোলগাল জল পুতুল একটা। শোভনা সারা দিন ব্যস্ত মেয়ে নিয়ে। ছেলেবেলার পুতুল খেলার দিনগুলো

ফিরে এসেছে যেন। এবার খেলার সঙ্গী প্রিয়ব্রত। পালা করে রাত জাগছেন দুজনে। কাঁথা পাল্টাচ্ছেন। দুধ খাওয়াচ্ছেন বোতলে করে। ক্রমশ বেড়ে উঠছে মেয়ে। এই বসা শিখল। এই হাঁটা। আধো আধো বুলি ঠোঁটে।···দৃশ্যপট বদল আবার। মেয়ে প্রথম স্কুল যাচ্ছে বাবার হাত ধরে। তুলতুলে পাখির ছানা ডানা মেলে উড়তে শিখছে প্রথম। বাবা মা'র হাত ধরে এক চোখে খুশি চিকচিক। অন্য চোখে ভয়।··· সেই মেয়ে দেখতে দেখতে কবে সে এত বড় হয়ে গেল। চাঁদের কলার মত বাড়তে বাড়তে পরিপূর্ণ নারী কখন। স্কুল পাশ করে কলেজে গেল। বি এ পাশ করে মাস দুয়েক হল শর্ট হ্যান্ড টাইপিংয়ে ভর্তি হয়েছিল। টিউশানিও ধরেছিল গোটা দুয়েক। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে ভাইয়ের জন্য ঘড়ির ব্যান্ড কিনে এনেছিল। শোভনার জন্য এক শিশি পারফিউম। বাবার জন্য আফটার শেভ।

প্রিয়ব্রত হেসেছিলেন—এসব কি আমার সহ্য হবে রে? এই বয়সে? ছাপোষা মানুষ। এসব কোনদিন আমাকে ব্যবহার করতে দেখেছিস?

মেয়ে চোখ পাকিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,—ছাপোষা মানুষদের বুঝি সুখ-আহ্লাদ থাকতে নেই?

—তা নয়। কোনদিন তো এসব মাখিটাখিনি। সেই আঠারো বছর বয়স থেকে দাড়ি কামানো ধরেছি। বাহান্নোয় পা দিলাম। এখনও সেই আদি অকৃত্রিম ফটকিরি। মাঝে মধ্যে শীতকালে একটু ক্রিমটিম লাগাই। তাও তোর মার পাল্লায় পড়ে। কেটে গেলে ভ্যাসলিন। ডেটল।

—এবার থেকে অ্যাটোমাইজার লাগাবে। যাক ফুরোলে আবার কিনে দেব।

শোভনা হেসেছিলেন চোখ টিপে—ও! বাবার বেলাতে কিনে দেব। আর আমারটা যে নিজে কিনে নিজেই মেখে শেষ করছিস। তার বেলা!

—তুমি মাখো না কেন? মাখলেই পারো শেষ হলে তোমারও আসবে। বলতে বলতে মাথা দোলাচ্ছে,—দাঁড়াও না। একটা চাকরি পেয়ে নিই তখন দেখবে তোমাদের দুজনকেই···

—আর তোমাকে আমাদের দেখে কাজ নেই। এবার তালয় তালয় পার করতে পারলে বাঁচি।

—উফ্। তোমাদের এখনও কিসব প্রিমিটিভ আইডিয়া। মেয়ে মানেই আগে বিয়ে। কোনরকমে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলা।

এরকমই পাকাপাকা কথা চিরটাকাল। সেই ছোট্ট থেকেই। সারাদিন হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে। কারণে অকারণে হাসি খিলখিল করে। আর ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি। প্রায়ই মারপিঠ। হাতাহাতি। পরক্ষণেই ভাব আবার। আর কি কোনদিন হাসতে পারবে সেভাবে! বাবলুও কি....

শোভনা আলগোছে চোখের কোলে জমা বাষ্পটুকু মুছে নিলেন। মেয়ের গায়ের কাছে, বিছানায় উঠে বসলেন।

—শোন। মন খারাপ করিস না। সব ছিল ঠিক হয়ে যাবে।

প্রিয়ব্রতও এগিয়ে এসে হাত রাখলেন মেয়ের মাথায়,

—ভয় পাস না। আমরা আছি তো।

বলতে বলতে স্বর কেঁপে গেছে। মেয়ের ব্যাপারে প্রিয়ব্রত চিরদিনই বড় দুর্বল। শোভনার থেকেও। শোভনা একবার স্বামীকে দেখে নিয়ে আবার মেয়ের দিকে ফিরলেন। দৃঢ় হল গলার স্বর,

—তুই ভয় পাবি কেন? লজ্জাই বা কিসের? অন্যায় তো তুই করিস নি। যারা করেছে ··

সুতপা আচমকা ফিরে মুখ গুঁজে দিল মায়ের কোলে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার দমকে গোটা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। শোভনা হাত বোলাচ্ছেন মেয়ের পিঠে। কাঁদুক। প্রাণভরে কেঁদে নিক। কান্নায় অনেক গ্লানি ধুয়ে যায়। প্রিয়ব্রত মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। জানলার বাইরে তাকিয়ে সামলাচ্ছেন নিজেকে।

পাশের বেডের মহিলাটি তখনই খবরটা দিলেন। খাটের পিঠে হেলান দিয়ে আপেল চিবোতে চিবোতে বলে উঠলেন,

—আজ বেলায় পুলিশ এসেছিল তো। সব জেনে নিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত চমকে তাকালেন,—এসেছিল?

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল আপনার মেয়ের সঙ্গে।

প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল,—কি বলল ?

তা অত বলতে পারব না। পর্দা টেনে দিয়ে কথা বলছিল। নার্স বলল, বড় দারোগা।

পর্দা যদি এখনও টেনে দেওয়া যেত। অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে এদিকে। দু-একজন তো অসভ্যের মত একেবারে সামনে এসে হাঁ করে দেখে যাচ্ছে। যেন কোন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু। যে মহিলাটি কথা বলছেন তাঁরও বলার ভঙ্গি খুব শোভন নয়। তাঁর পাশে টুলে বসা রোগা মতন যুবকটি প্রশ্ন করে উঠল,

—পুরো রেপ করেছে ? না ট্রাই নিয়েছিল ?

মহিলা চটপট উত্তর করলেন—না। না। পুরোই। কাল রাত্তিরে কি অবস্থায় না এসছিল···রাতভর কি কাঁপুনি···গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে গাল দিয়ে।

মেয়েরও নিশ্চয়ই কানে যাচ্ছে কথাগুলো। কান্না থেমে গেছে। শোভনা টের পেলেন শরীর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে মেয়ের। ওর সামনে এসব কথা কি জোরে জোরে না বললেই নয় ? এতটুকু জ্ঞানগম্যি থাকবে না মানুষের ? নাকি এও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। যা মানুষই করতে পারে।

বিরক্ত মুখে স্বামীর দিকে তাকালেন শোভনা। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

—তপুকে এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না ?

প্রিয়ব্রতও বিরক্ত হয়েছেন। অন্যের ব্যাপারে মানুষ কেন যে এত কৌতূহল দেখায়! একজনের যন্ত্রণা আরেকজনের কাছে মুখরোচক খোরাক হয়ে ওঠে! দুটি মেয়ে এধারে এসে এবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সন্তর্পণে। মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়ালেন,

—ডাক্তারের সঙ্গে, কথা বলে দেখো একবার। একটা কেবিনের ব্যবস্থা যদি করা যায়···

—না। তুমি বণ্ড সই করে দাও। ওকে আমি নিয়ে যাব। আজই।

শোভনা দুহাতে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আরও

ভাল করে। পারলে আঁচল দিয়ে ঢেকে দেন।

প্রিয়ব্রত যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। ওঁদের কাছে তপু কি নাম বলতে পেরেছে শয়তানগুলোর? অ্যারেস্ট হয়েছে তারা? ডাক্তার নার্সরা কি কিছু বলতে পারবে? শোভনাকে বাড়ি পৌঁছে থানায় যেতে হবে একবার। তাঁর মেয়ের এমন অবস্থা যারা করেছে তাদের তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না।

সুতপার শরীর এখনও শক্ত হয়ে আছে। শোভনা মেয়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন,

—কারুর কথায় কান দিস না তপু। মনে সাহস আন। ভেঙ্গে পড়লে পাঁচজনে আরও পেয়ে বসবে। মজা করবে তোকে নিয়ে।

সুতপা দুহাতে শোভনার কোমর আঁকড়ে ধরল।

শোভনা গলা আরও নিচু করলেন,

—চিনতে পেরেছিলি তাদের? ভয় পাস না। বল আমাকে। চিনিস?

মেয়ে খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

শোভনা ফিসফিস করে উঠলেন—কারা?

মেয়ে অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল কোল থেকে। বিছানায় টান-টান হয়ে শুল। শোভনা শিউরে উঠলেন। মেয়ের দুগালে চাকাচাকা দাগ দাঁতের। হিংস্র নখের। ওপরের ঠোঁট ভীষণভাবে ফুলে উঠে ঢেকে দিয়েছে নিচের ঠোঁটকে। ফোলা চোখের তলায় ঘন কালশিটে। আরও কত দাগ পড়েছে এরকম? কোনোদিন উঠবে এ দাগ মেয়ের শরীর থেকে? বুকের মধ্যে জমে থাকা গুমোট ভাব কান্না হয়ে উঠতে চাইছে। তবু সংযত থাকতেই হবে। চাদর টেনে ভালভাবে ঢেকে দিলেন মেয়ের শরীর। মেয়ে চোখ বুজে রয়েছে। দুগাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। কানের পাশ বেয়ে টপটপ গড়িয়ে গেল বালিশে। নিচে একটা সাইরেনের মত শব্দ শোনা গেল। কোন অ্যাম্বুলেন্স ঢুকল বোধহয়।

শোভনা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। মেয়েকে আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

কাল রাত থেকে দু চোখের পাতা এক হয়নি একবারও। আজও ঘুম আসবে না। পাশে জেগে আছেন শোভনাও। থেকে থেকে স্ত্রীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন প্রিয়ব্রত। এ নিশ্বাস ঘুমের নয়। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারছেন। সন্ধ্যেবেলা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি শোভনা। কাল সকালে মেয়েকে বন্ড সই করে না নিয়ে আসা পর্যন্ত বলবেনও না। প্রিয়ব্রত জানেন। ফিরে এসে জল পর্যন্ত খাননি। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েছেন। প্রিয়ব্রতর বুকটা টনটন করে উঠল। তপুকে তিনি কি কম ভালবাসেন? শোভনার থেকে কি কম আঘাত পেয়েছেন তিনি?

সন্ধেবেলা, শোভনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, একা একাই গিয়েছিলেন থানায়। থানার চেহারা তখন একেবারে অন্যরকম। বিকেলের মুখে কারেন্ট এসে গেছে। কাল রাতের ঘরখানায় হাই পাওয়ারের আলো জ্বলছে গোটা দুয়েক। লো ভোল্টেজের জন্য মাঝে মাঝে ম্রিয়মান হয়েও উজ্জ্বল হচ্ছে দপ করে। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে মাথার ওপর ঘুরে চলেছে আদ্যিকালের দুটো ঢাউস ফ্যান। দেওয়ালে ঝোলানো আর টি বক্স থেকে ভৌতিক স্বর বেজে চলেছে একটানা। জড়ানো স্বরে। কান পেতে থাকলেও এক বর্ণ বোঝা যায় না। ঘরের কেউ শুনছেও না সেভাবে। মেজ দারোগা আর ডিউটি অফিসারটি ছাড়া আরও দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর বসে কালকের ফাঁকা টেবিল চেয়ারে। বেঞ্চটাও পরিপূর্ণ। এক মহিলা আর জনা তিনেক পুরুষ উবু হয়ে বসে আছে মাটিতে। বোধহয় ফ্যাক্টরির লেবার টেবার। প্রিয়ব্রত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই শুনতে পেলেন মেজ দারোগা তাদের উদ্দেশে বলে উঠল,

—বডি কি করে পাবি এখন? মর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গরীব মতন বউটি কেঁদে উঠল হাউ মাউ করে। একটা লোক টেবিলের তলা দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগার পায়ের ওপর। দারোগা নির্বিকার,

—পায়ে পড়ে কি হবে ? বললাম তো কাল পাবি। এখন বাড়ি যা। বলতে বলতে দাঁতের ফাঁকে নখ ঢোকাল। খাবারের কুচি বার করে ফেলল থুথু করে,

—যা। যাহ্। আর জ্বালাস না এখন।

একটা মানুষের মৃত্যু, একটা মানুষের লাশ কত সহজ ঘটনা পুলিশ, ডাক্তারদের কাছে। ডাক্তারদের থেকেও পুলিশরা বোধহয় এসব ব্যাপারে বেশি উদাসীন। বেশি নির্মম। সবসময় দেখে দেখেই হয়ত। প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। বেঞ্চিতে মাথায় পট্টি বেঁধে বসে বাবলুরই বয়সী একটা ছেলে। তাকে চেপে ধরে রয়েছে দুজন। ডিউটি অফিসারটির সামনে বসে আরও দুজন রিপোর্ট লেখাচ্ছে। লিখতে লিখতে কাল রাতের ছোকরা অফিসারটি চোখ তুলে একবার দেখলও প্রিয়ব্রতকে। দেখলই। চিনতে পারল না যেন। প্রিয়ব্রত তার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন,

—আমি কাল রাতে এসেছিলাম।

—হুঁ। বলুন।

—উনি নেই শুনলাম। বেরিয়ে গেছেন। আমি একটু আপনার সঙ্গে....

—আপনার কেসটা বড়বাবু টেকআপ করেছেন। ওনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—কখন ফিরবেন উনি ?

—বলতে পারছি না। রাত হতে পারে। এস পি কে মিট করতে গেছেন।

প্রিয়ব্রত তবু একটু ইতস্তত করলেন। বসবেন একটু। যদি এসে যান ? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরের করিডোরে এলেন। দুজন কনস্টেবল বাইরের বেঞ্চিতে বসে খৈনি টিপছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনার সেই রেপ কেসটা তো ?

প্রিয়ব্রত অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে ফেললেন। পৃথিবীশুদ্ধ লোক বোধহয় এতক্ষণে জেনে গেছে প্রিয়ব্রতবাবুর মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। বাড়ির দিকে আসার সময় নতুন বাজারের সেই ভদ্র-

লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেনে অফিস যান। আলাপ পরিচয় আছে। ঘনিষ্ঠতা নেই তেমন। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এলেন।

—কি দাদা? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রিয়ব্রত ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলেন ইনিও কিছু জানেন কি না।

—এই একটা কাজে···।

—অফিস যাননি আজ?

—না। প্রিয়ব্রত নিশ্চিন্ত মনে হাসলেন সামান্য। অনেকক্ষণ পর। তখনই ভদ্রলোক দুম করে প্রশ্ন করেছেন—আপনি সুভাষ পল্লীতে থাকেন না? কাল রাতে ও পাড়ার একটা মেয়ে নাকি রেপড হয়েছে? চেনেন নাকি?

প্রিয়ব্রত ঢোক গিললেন। মুখ পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কেউ। কোনরকমে মাথা দোলালেন—হ্যাঁ।

—কালপ্রিটরা ধরা পড়েছে কেউ?

—না। প্রিয়ব্রত আমতা আমতা করে বলে ফেললেন—পড়বে। ধরা পড়তেই হবে।

মশারির মধ্যে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেলেন প্রিয়ব্রত। আকাশে এক ফোঁটাও মেঘ নেই আজ। তবু এত গরম। মধ্য বৈশাখ উত্তাপ ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে। টিকিস টিকিস করে ফ্যান চলছে। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে শোভনাকে দেখার চেষ্টা করলেন। জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাতে ঘর জুড়ে ঠিক অন্ধকার নয়; আবছায়া। মশারি তুলে নেমে পড়লেন। জল খাবেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মশারির চালে রাখা বেড সুইচ টিপতে গিয়েও টিপলেন না। থাক। শোভনার অসুবিধে হবে। ডাইনিং স্পেসে এলেন। ডাইনিং স্পেস বলতে সরু লম্বাটে খাওয়া দাওয়া করার জায়গা এক ফালি। ওপাশে ওঁদের ঘরের মুখোমুখি বাইরের ঘর। তার পাশের ঘরটা বাবলু, সুতপার। এ পাশে রান্নাঘর। বাথরুম। সাড়ে আটশো স্কোয়ার ফুটের এই বাড়িটুকু তুলতে দেনা হয়ে গেছে

অনেক। অফিস থেকে প্রতিমাসে লোনের জন্য বেশ মোটা টাকা যায়। তাও এখনও বাইরেটা প্লাস্টার করতে পারেননি। আগের বর্ষাতে প্রায় সব কটা ঘরেই জায়গায় জায়গায় ড্যাম্প ধরেছে।

শোভনা বলেন—থাক। যেমন আছে। তপুর বিয়েটা আগে হয়ে যাক। তারপর দেখা যাবে। এখন কিছুতে আর হাত দিতে হবে না।

মেয়ের বিয়ের জন্য বছর দুয়েক ধরেই তাগাদা লাগাচ্ছেন শোভনা। প্রিয়ব্রত খুব একটা গা করেননি কোনদিনই। খালি মনে হয় আর কটা দিন যাক। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে যে। তাছাড়া টাকা পয়সারও তো দরকার। আর টাকা পয়সা। মেয়েটার কোনদিন বিয়ে হবেই কি না কে জানে। উদার মানুষ কটা আছে পৃথিবীতে। প্রিয়ব্রত ডাইনিং টেবিল থেকে জগ তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন ঢক ঢক করে। বাইরে দু তিনটে কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল। খসখস শব্দ হল কিসের। দরজায় আলগাভাবে টোকা দিল কেউ। ডাইনিং স্পেসের দরজায় নয়। বাইরের ঘরের দরজায় আবার শব্দ হল। এবার বেশ জোরে। কে এল এত রাতে! তপুরে কি বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে খবর এল! সুখেন্দুবাবু ফোন নম্বর দিয়ে এসেছেন হাসপাতালে। সুখেন্দুবাবুদের বাড়ি থেকে কি কেউ…! নাকি…! আজানা আশংকায় প্রিয়ব্রতর বুক ধড়ফড় করে উঠল।

—কে? কে এ এ?

আরও জোরে ধাক্কা পড়ল। শোভনা উঠে এসেছেন বিছানা ছেড়ে। বাবলুও ধড়ফড় করে বেরিয়ে এলে বড় আলো জ্বালিয়ে দিল। দৌড়ে যাচ্ছে দরজা খুলতে। প্রিয়ব্রত প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—দাঁড়া। তুই খুলিস না। আমি যাচ্ছি।

দরজার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে প্রথমটা চিনতে পারেননি প্রিয়ব্রত।

বাবলু বিস্মিত প্রশ্ন করেছে—একি কাজলদা! তুমি! এখন!

কাজল ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। দুচোখ

নেশায় টকটকে হয়ে আছে। বেতের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল ধপ করে। প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে গেছেন। বাবলুও হতবাক শোভনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এপাশের দরজা ধরে।

প্রিয়ব্রত কথা বললেন বেশ কয়েক সেকেন্ড পর।

—কি ব্যাপার কাজল? কিছু বলবে?

কাজল থরথরে চোখে তাকাল। প্রিয়ব্রতর দিক থেকে চোখ বাবলুর দিকে। বাবলুকে দেখে নিয়ে শোভনাকে দেখল।

—শুনুন। স্ট্রেটকাট কথা বলে নেওয়া ভাল।

—কি কথা বাবা?

কাজলের উদ্ধত ভঙ্গি দেখে ভয় গেলেন প্রিয়ব্রত। স্বাভাবিকভাবেই চোখ বাবলুর দিকে পড়েছে। বাবলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে। শোভনা এগিয়ে এলেন।

—কি বলতে চাইছ?

—ন্যাকা সাজছেন কেন? জানেন না কিছু? কাজল আচমকা চমকে উঠল – শোনেননি মেয়ের কাছে? মেয়ে তো সবার নামই বলে দিয়েছে।

শোভনা, প্রিয়ব্রত দুজনেই প্রায় একসঙ্গে আঁতকে উঠেছেন।

—মি!

—হ্যাঁ। আমি। আমি। বলতে বলতে হঠাৎই গলা নামিয়ে ফেলেছে।

—মদ খেয়েছিলাম। মেজাজটা খারাপ ছিল। হঠাৎই হয়ে গেছে। যা কমপেনসেশন চান দিতে রাজি আছি।

বাবলু দুম করে তেড়ে গিয়ে সজোরে গলা চেপে ধরেছে কাজলের। চকিত উত্তেজনায় হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

—তুমি! তুমিই!…

কাজল অতি সহজেই ধাক্কা মেরে ছিটকে দিল বাবলুকে। চৌকির পাশে আছড়ে পড়ল বাবলু। পায়ার লেগে কপালের কোণা কেটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। শোভনা দৌড়ে গেছেন।

—মারছ কেন ওকে?

—মারিনি তো! তবে দরকার হলে…কাজলের গলা মুহূর্তে শীতল। বরফের মত। জানেনই তো আমি খুব খারাপ

ছেলে।

—তুমি আমাদের ভয় দেখাতে এসেছ ?

—না ভরসা দিতে এসেছি। নিজেদের ভাল চান ছেলে মেয়ের ভাল চান তো কোন তিকড়মবাজি নয়। কাল থানায় গিয়ে রিপোর্ট উইথড্র করে আসবেন।

—ওভাবে রিপোর্ট উইথড্র হয় না। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন আছে…মেডিকেল রিপোর্ট…

—কিছুই থাকবে না। মেয়েকে বলবেন অন্ধকারে কাউকে চিনতে পারেনি। বাকিটা আমি দেখব।

ঠাণ্ডা মাথায় ছেলেটা ঘরে ঢুকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়ব্রতর ইচ্ছে হল চিৎকার করে পাড়ার লোকজনকে ডাকেন। দরজার দিকে এগিয়েও ছিলেন, কাজল তার আগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—লাভ হবে না মেসোমশাই। বাইরে আমার লোকজন আছে। আমাদের দেখলে কেউ আসবে না সাহায্য করতে। থানায় তো সন্ধেবেলাও গিয়েছিলেন। সুবিধে হয়েছে ?

শোভনা চিৎকার করে উঠলেন—গুণ্ডা। বদমাইশ। শয়তান।

—চিৎকার করবেন না মাসিমা, যা বলার আস্তে বলুন।

—তুমি আমাকে মাসিমা বলে ডাকবে না। খবরদার।

প্রিয়ব্রত হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন—কেন তুমি আমাদের এই সর্বনাশ করলে ? কি অপরাধ করেছি ? তপু কি ক্ষতি করেছিল তোমার ?

—আহ ! কাঁদবেন না। কাজলের ভুরু কুঁচকে গেল—কান্নাকাটি করার কিছু হয়নি। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। মেয়েকে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। খরচা-পাতির জন্য ভাবতে হবে না। শুধু একটা কথাই মেয়েকে শিখিয়ে দেবেন ভাল করে। কাল রাত্রে সে তিনজনের একজনকেও চিনতে পারেনি।

শোভনা দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন—না। ও কথা আমরা কখখনো বলতে পারব না তপুকে।

—সেটা আপনাদের ব্যাপার। কাজল কথা বাড়াল না। ধীর পায়ে হেঁটে একবার বাবলুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাবলুর

জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল ঠোঁট চেপে। বাইরের ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো আলতো করে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

—জানি অনেক কষ্ট করে বাড়িটা তৈরি করেছেন। বসবাস যদি একেবারেই উঠিয়ে চলে যেতে চান আলাদা কথা। তবে মনে রাখবেন, আমাকে যদি ফেঁসে যেতে হয়, রামনগর ছাড়ার আগে আপনাদেরও ছেলেমেয়েকে এখানকার শ্মশানে রেখে যেতে হবে। সব উড়িয়ে দেব। বলেই সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

❑ ২রা মে ভোর চারটে ❑

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয়ব্রত পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ এখনও জাগেনি। গোটা পাড়া ভোরের নরম হাওয়ায় ঘুমিয়ে আছে আরাম করে। দিনের প্রথম স্নিগ্ধতায় পৃথিবী ভারী শান্ত। ঠাণ্ডা নরম বাতাস বইছে মৃদু। তবু হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছিল প্রিয়ব্রতর। আরও একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এত সকালে কারা যেন বেরিয়ে পড়েছে। অনুতোষ নাকি! সঙ্গে কে! পাশের গলির চ্যাটার্জিবাবু না! মর্ণিং ওয়াকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন এঁরা। প্রিয়ব্রত মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। ওঁরা আরও কাছে আসতে নিশ্চিন্ত। না। অনুতোষ বা চ্যাটার্জিবাবু নয়। দুজনেরই মুখ চেনেন প্রিয়ব্রত। বিশেষ আলাপ পরিচয় নেই। তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। মানুষ দুজন বাঁদিকে ঘুরে যাওয়ার পর দ্রুত পা চালালেন। যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছতে হবে। সকালেই বণ্ড দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসবেন মেয়েকে।

বড় রাস্তায় পড়ার আগে ডানদিকে বিপিনবাবুর বাড়ি। হলুদের ওপর মেরুন বর্ডার দেওয়া। দোতলা বাড়িটা পার হওয়ার সময় প্রিয়ব্রতর বুক হিম হয়ে গেল। বিপিনবাবুর খোলা জানলাগুলোর গায়ে দামী রঙীন পর্দা বাতাসে পতপত দুলছে। দুলছে না। যেন হাসছে হি হি করে। হলুদ রঙ বাড়িটা কাজল হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। একদমে শনি মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলেন। নিজেকে এত অসহায় জীবনে লাগেনি। নিজের ওপর ঘৃণা আসছে। কি করলেন সারা জীবনভর? আজীবন পরিশ্রম করেও নিশ্চিন্ততা দিতে পারলেন স্ত্রীকে? ছেলেকে? মেয়েকে? ওভাবে হয় না। অন্তত আজকের দুনিয়াতে।

বুড়ো শিবতলার দিক থেকে একটা খালি সাইকেল রিক্সা আসছে। দিনের প্রথম রিক্সা চলতে শুরু করল বোধহয়। প্রিয়ব্রত হাত বাড়িয়ে ডাকলেন—দাঁড়াও ভাই, হাসপাতালে যাব।

রিক্সায় বসে পেছন ফিরে তাকালেন। না। হলুদ বাড়ি আর দেখতে পাচ্ছে না তাকে। আধা তৈরি ফ্ল্যাট বাড়িটা পার হওয়ার সময় চোখ বুজে রইলেন। কাল থেকে ওই বাড়িটাও গিলে খেতে চাইছে তাঁকে। সর্বক্ষণ। কংকাল শরীর নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে। দ্যাখো, দ্যাখো। আমাকে দেখে যাও। বর্তমান সভ্যতার ছোট্ট একটা প্রতীক আমি। স্কাই স্ক্র্যাপারের ছোট ভাই। সর্বত্রই আমি এখন। শহরে, মফস্বলে। আমারই খাঁচার মধ্যে তোমার একমাত্র মেয়ে···তোমার আদরের মেয়ে···ওফ। প্রিয়ব্রত এখন কী যে করেন। বাইশ বছর আগে এখানে এসে যখন বাসা ভাড়া করেছিলেন তখনও কী জনহীন ছিল অঞ্চলটা। স্টেশনের ওপারে, নতুন পল্লীর দিক থেকে রাতে শেয়াল ডাকত। চারদিকে ঘন গাছপালা। সব বাড়িতেই প্রায় একটা করে ছোট পুকুর। প্রিয়ব্রতরা থাকতেন প্রথমে চৌধুরিবাগানে। সেখান থেকে উঠে অনুতোষবাবুর বাড়িতে। সুতপা তখন বেশ ছোট। মাও বেঁচে। শ্যামবাজারের ঘিঞ্জি থেকে খোলামেলা জায়গায় উঠে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছিলেন মা। শোভনার অবশ্য মন বসত না প্রথম প্রথম। হাতিবাগানের মেয়ের বেশি নির্জনতা পছন্দ না হওয়ারই কথা। পরে শোভনাই জায়গাটাকে ভালবেসে ফেললেন সব থেকে বেশি। অনুতোষবাবুদের সঙ্গে একত্র বসবাস থেকে বন্ধুত্ব। পাশেই দুকাটা জমি সস্তা দরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। অনুতোষবাবু বুদ্ধি দিলেন।

—কিনে রাখুন। এরপর আর এদিকের জমিতে হাত দিতে পারবেন না।

প্রিয়ব্রত ইতস্তত করেছিলেন। পয়সা কোথায়? শোভনাই উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন। কিছু ধার আর শোভনার গয়না বেচে প্রায় দশ বছর আগে কেনা জমি। বাড়ি তুলেছেন বছর আড়াই। দেখতে দেখতে সত্যিই হুহু করে বেড়ে গেল জমির দর। এদিকে এখন তিরিশ চল্লিশ হাজার করে কাঠা আছে। স্টেশনের কাছে, নতুন বাজারের দিকে আরও বেশি। লোহা, ইট, কাঠ, চুণ, সুরকিও দ্যাখ-না-দ্যাখ গরম হয়ে গেল। অনুতোষবাবু দূরদর্শী মানুষ। তাঁর পরামর্শেই না.... ।

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরানোর চেষ্টা করলেন। হাওয়ায় বারবার নিভে যাচ্ছে। যদিও রিক্সাওলাটা গাড়ি চালাচ্ছে বেশ ধীরে ধীরে। বুড়ো মানুষ। বোধহয় বুড়ো শিবতলার ওদিকেই থাকে। পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস বেরিয়ে গেল। এদিকে এখন অনেকগুলো বাসরুট হয়ে গেছে বছর পাঁচেক। প্রিয়ব্রত ট্রেনেই যান। সুবিধা হয়। এখান থেকে শেয়ালদা পঁয়ত্রিশ মিনিট। সেখান থেকে হেঁটেই এসপ্ল্যানেড। কাল অফিস যেতে পারেননি। অফিসে একটা খবর পাঠানোর দরকার। তপুকে বাড়িতে রেখে সময় পেলে স্টেশন পল্লীর অজয় দাসকে একটু বলে আসতে হবে। অফিসে যেন খবর দিয়ে দেয়। ভাবতে গিয়ে ফের অস্বস্তি। পরশু রাতের কেচ্ছাকাহিনী গোটা রামনগর জেনে গেছে। অজয় দাসও হয়ত...। অফিসেও কি পৌঁছে গেছে সংবাদ? ডেভিড ফ্লেট অ্যান্ড চাটারিং-এ দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছেন। বড় সাহেব থেকে বেয়ারা পর্যন্ত সকলের কাছে একটা আলাদা জায়গা আছে তাঁর। অ্যাকাউন্টস অফিসার। একশো পঁচিশ টাকা থেকে মাইনে বেড়ে পৌনে চার হাজার। তার থেকে বাদ যায় পাঁচশো মতন। তাই দিয়ে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা, সংসার চালানো, নিজস্ব হাত খরচ। দিনদিন বাজার আগুন হয়ে উঠছে। কংগ্রেস সরকার গিয়ে ভি. পি. সরকার কেন্দ্রে। কিছুদিন আগেই ইলেকশন হয়ে গেছে। আশা ছিল নতুন গভর্নমেন্ট এসে কিছু একটা করবে। আশায় ছাই। প্রায় তেরো বছর গদিতে থেকে বামফ্রন্টই বা কি করল পশ্চিমবঙ্গের। টপাটপ কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখানে ওখানে। আধা সরকারি

সংস্থাগুলোর অবস্থা বেহাল। দুর্নীতিতে দশ দিকে ছেয়ে গেছে। রাজনীতি স্বার্থকেন্দ্রিক। হিংস্রতা আর দম্ভের নামান্তর। নইলে কাজলের মত ছেলেরা…

ভাবনায় ছেদ পড়ল। নীরবে রিক্সা চালাতে চালাতে বুড়ো লোকটা কথা বলে উঠেছে হঠাৎ। প্রিয়ব্রত চমকে উঠলেন

—বাবু আপনার মেয়ে কেমন আছে ?

প্রিয়ব্রত প্রথমটা কোন উত্তর করলেন না। লোকটা একভাবে সাইকেলে প্যাডেল করে চলেছে। একমাথা সাদা চুল। পিঠটা সরু। লম্বা মতন। এদিককার অনেক রিক্সাওলাই তাঁর চেনা। কিন্তু ওই লোকটাকে কোনদিন দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। বুড়ো মানুষ যখন অনেকদিন ধরেই হয়ত রিক্সা চালাচ্ছে। কিম্বা না। এপাশ ওপাশের গ্রাম থেকে আজকাল তো অনেকেই রামনগরে চলে আসছে জীবিকার খোঁজে। বুড়ো শিবতলার দিকে বেশ বড়সড় বস্তি গজিয়ে উঠেছে। হয়ত লোকটা…

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে লোকটা চুপ মেরে গেছে আবার। ঘাড় গুঁজে রিক্সা চালাচ্ছে। হাসপাতাল আর বেশি দূরে নয়। মিনিট তিন চার গেলেই....। আরেকটা বাস হর্ণ বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল। স্টেশনের দিক থেকে বেশ কয়েকটা রিক্সা এল পরপর। দোকানাপাঠ এখনও খোলেনি। জেগেও জাগেনি রামনগর।

একটুক্ষণ পর প্রিয়ব্রত নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুমি আমাকে চেনো ?

চিনি বাবু। আপনার মেয়েকেও চিনি। কতদিন রিক্সা করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছি।

—ও।

—বাবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—বলো।

—শয়তানগুলোর কোন খোঁজখবর পেলেন ? কারা অমন সুন্দর মেয়েটাকে…?

প্রিয়ব্রতর বুকটা ধক করে উঠল। কাজলের মুখ চোখের সামনে এসেই মিলিয়ে গেছে। জোরে শ্বাস ফেললেন,

—নাহ্ ।

এবার রিক্সাওলা চুপ। ঘিয়ে রঙ সরকারী হাসপাতালে আর কয়েক ফুটের মধ্যে। আর পা দশেক গেল রিক্সা। তারপর বুড়ো আবার কথা বলেছে,

—আমারও একটা মেয়ে আছে বাবু। ওরকমই। আমি বুঝি। বাপের বুকে কি বাজে।

লোকটা মাথা নাড়ছে মৃদু মৃদু। প্রিয়ব্রতর গলার কাছে একটা শক্ত ডেলা আটকে গেল। লোকটার স্বরে কৌতূহল নয়। সহানুভূতি। এক বাপের প্রতি অন্য বাবার। শব্দ শুনেই অনুভব করা যায়।

হাসপাতালের মেন গেটে রিক্সা দাঁড় করাল লোকটা,

—আমি হলে বাবু ঠিক হারামীগুলোকে খুঁজে বার করতাম। সব কটাকে খুন করে ফাঁসি যেতে হয়, যেতাম। তবু শালা একটা শুয়োরের বাচ্চাকে বেঁচে থাকতে দিতাম না। শেষ করে দিতাম সব কটাকে।

প্রিয়ব্রতর চোয়াল মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল। সত্যিই যদি ঝাড়ে বংশে সব শেষ করে দেওয়া যেত! একেবারে মূল ধরে টান দিলে…। কিন্তু টানবে কে? প্রিয়ব্রত? একা? না রিক্সাওলা বুড়ো যা পারে প্রিয়ব্রত তা পারেন না। মধ্যবিত্তের মন শামুকের মত। লোকটাকে খুলে বলবেন নাকি সব কথা? বললে কি পাশে দাঁড়াবে? আজকালকার দিনে কে কার বিপদে নাক গলায়। রিক্সাওলার মেয়েকে যদি গুন্ডারা ধর্ষণ করত, প্রিয়ব্রত যেতেন কি? রিক্সাওলা না হয়ে লোকটা যদি নিছক প্রতিবেশী হত, তাঁরই সমগোত্রীয় কেউ, তাহলেও কি যেতেন?

ভাড়া মিটিয়ে ম্লান হাসলেন প্রিয়ব্রত।

—তোমার কি একটিই মেয়ে ভাই?

—না বাবু। চারজন। ছোটটা আপনার মেয়ের মত। তিনজনের বিয়ে দিয়েছি। এটাকে পার করতে পারলেই শান্তি। আপনার তো…

আমার একটিই।

—জানি বাবু। শুনেছি। বি এ পাশ। ভাল মেয়ে। বলতে বলতে বৃদ্ধ মুখে সান্ত্বনা ফুটেছে,—চিন্তা করবেন না বাবু।

রামীর বাচ্চাগুলো ঠিক ধরা পড়বে। ধম্মো আছে না?

প্রিয়ব্রত আবারও ম্লান হাসলেন।

☐ ২রা মে রাত সাড়ে এগারোটা ☐

ভীষণ সরু একটা অন্ধকার গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে সুতপা। এত সরু যে সোজা হয়ে হাঁটা যায় না ভালভাবে। দুধারে বিশাল উঁচু দেওয়াল। পাহাড়ের মত উঁচু। গোটা রাস্তায় এক বিন্দু আলো নেই কোথাও। তবু সুতপার মনে হচ্ছিল আরেকটু এগোলেই আলো পাবে। অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল একটু একটু করে। রাস্তাটা হঠাৎ দুলতে শুরু করল। দুলতে দুলতে আঁকাবাঁকা সাপের মত। সুতপা যত এগোয়, সাপও চলে। সুতপা দৌড়তে শুরু করল। কোথা থেকে এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে কাজল। ভাঁটার মত লাল চোখ। দাঁতে কুৎসিত হাসি। সুতপা চেঁচিয়ে উঠতে গেল। কোন শব্দ ফুটছে না গলায়। জোর করে আওয়াজ আনতে চাইল। ঠিক তখনই কে যেন আলগা ধাক্কা মেরেছে।

—এই তপু? কি হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি? এই তপু?

সুতপা ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। মুহূর্তের জন্য চোখ খুলল। বন্ধ করল। আবার খুলল। তারপরই এক ঝটকায় ঘোর কেটে গেছে।

শোভনা মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বসে রয়েছেন,

—কি কষ্ট হচ্ছে তপু? জল খাবি?

সুতপা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

শোভনা উঠে জল খাওয়ালেন মেয়েকে। মশারির মধ্যে ফিরে এসে গালে কপালে ঘাড়ে জল হাত বুলিয়ে দিলেন। গলার নিচে, বুকের কাছে এত বড় একটা কালশিটে। গালে এলোমেলো নীলচে দাগ। চোখ ঠোঁট এখনও ফুলে আছে। কপালের ফাটার ওপর ছোট ব্যান্ডেজ। মেয়েকে সকালেই হাসপাতাল থেকে জোর করে নিয়ে এসেছেন প্রিয়ব্রত। ডাক্তাররা ছাড়তে চায়নি। শারীরিক আঘাতগুলো ছাড়াও শরীর এখনও খুবই দুর্বল। হাঁটতে গেলে টলে

যাচ্ছে। নার্ভের অবস্থাও বেশ খারাপ। প্রচণ্ড অবসাদ মনে। ঘুমের ওষুধেও ঘুমোতে চায় না।

শোভনা মেয়ের কাঁধ ধরে আলতো করে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। এবার থেকে এ ঘরেই মেয়েকে নিয়ে শোবেন। প্রিয়ব্রত আর বাবলু ও ঘরে।

মেয়ে শুয়েও নিষ্পলক তাকিয়ে আছে মশারির নেটের দিকে। সকালে বাড়ি ফেরার পর থেকে কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। অনুতোষবাবু এসেছিলেন সন্ধেবেলা। তপু ফিরেছে শুনে তো হতবাক।

—সেকি? নিয়ে চলে এলেন? এর মধ্যেই?

প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—হ্যাঁ। ওর মা বাড়িতেই নিয়ে আসতে বলল।

শোভনা প্রতিবাদ করলেন না। কাল বিকেলে মেয়েকে আনার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু প্রিয়ব্রত যে ভোরবেলাই বেরিয়ে গেছেন তড়িঘড়ি করে, ফিরেছেন সেই বেলায়; সে কথা একবারও বললেন না অনুতোষবাবুকে।

অনুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন,—থানায় গিয়েছিলেন? কিছু জানতে পারলেন? বলেই গলা নামিয়েছেন,—তপু কিছু মনে করতে পারছে? কারা…

প্রিয়ব্রত এবার পরিষ্কার মিথ্যা কথা বললেন,—নাহ্। এমনকি অনুতোষ একবার তপুর সঙ্গে দেখা করার জন্য এ ঘরে আসতে চাইলে নির্বিকারভাবে বলে উঠলেন,—বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

শোভনা এবারেও চুপ করে থাকলেন। কাল থেকে নিজেও যে বুঝে উঠতে পারছেন না কি করবেন। মস্তানদের ভয়ে এত বড় অন্যায়টা মেনে নেবেন? এত বড় অপমান…

মেয়ের মাথায় আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিলেন শোভনা,

—কি রে, কি ভাবছিস?

—মেয়ে উত্তর দিল না।

—কথাই বলবি না আমাদের সঙ্গে?

মেয়ে তাও চুপ।

শোভনা নখ দিয়ে আলগা বিলি কাটলেন মেয়ের চুলে।

আস্তে আস্তে হাতের তালু ঠুকলেন মেয়ের মাথায়। ঠিক যেভাবে ছোটবেলায় ঘুম পাড়াতেন।

—ঘুমো মা। ঘুমিয়ে পড়।

মেয়ে চোখ বন্ধ করল। শোভনা বেডসুইচ নেভালেন।

তারও কিছুক্ষণ পর শোভনার যখন একটু তন্দ্রামতন এসেছে, সুতপা উঠে বসল বিছানায়। সকালবেলা ফেরার পথে বাবার কথা শুনে বুক একেবারে জমাট বরফ হয়ে গেছে। আর বোধহয় কোনদিন কোন কিছুতেই এ বরফ গলবে না।

হাসপাতালে যখন বাবা এসে বলল, চল, তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, তখন মুহূর্তের জন্য দুলে উঠেছিল মনটা। মুহূর্তের জন্যই। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কটকটে যন্ত্রণাটা গোটা শরীরে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। মাথা ঘুরে গেল। পৃথিবী দুলে উঠল চোখের সামনে।

বাবা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে,

—কিরে, পারবি তো হাঁটতে?

কষ্ট করে মাথা নাড়ল সুতপা। বাবার কাঁধে ভর দিয়ে কোনরকমে নিচে নামল। রিক্সায় উঠেই হুড তুলে পর্দা নামিয়ে দিয়েছে বাবা। তবু যেন বাইরের পৃথিবীটা হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ে। তীব্র যন্ত্রণাটা অসাড় করে ফেলল দেহটাকে।

রিক্সা চলতে শুরু করলে বাবা জিজ্ঞাসা করল,

—কিরে, কষ্ট হচ্ছে কোন?

ঠিক বলবে সুতপা? সব যন্ত্রণার কথা কি সব সময় বলে ফেলা যায়। শরীর নয়, কষ্টটা উঠছিল আরও গভীর কোথাও থেকে। ভয়, সংকোচ, লজ্জা, অপমান সব কিছু মেশানো এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। পরশু রাত থেকে যন্ত্রণাটা অশরীরী আত্মার মত ভেসে বেড়াচ্ছে সুতপার চারপাশে। শরীরে ঢুকে বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বুক থেকে শিরায়। ধমনীতে। শরীরের প্রতি কোষে কোষে। এ যন্ত্রণা একান্তই সুতপার। একেবারে নিজস্ব। বাবাও বিশেষ প্রশ্ন করল না আর। চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে। রিক্সা আরও খানিকটা পথ চলে যাওয়ার পর আচমকা গলা ঝেড়েছে,

—তোকে একটা কথা বলার ছিল তপু।

সুতপার বসতে কষ্ট হচ্ছিল। একটু নড়াচড়া করার চেষ্টা করল। বাবার প্রায় ফিসফিস—কাল রাত্তিরে কাজল এসেছিল বাড়িতে।

কালবৈশাখীর বাজ খুব কাছে কোথাও আছড়ে পড়লেও বুঝি এত চমকাত না সুতপা। সমস্ত শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ ঝলসে গেছে।

—আমাদের ভয় দেখাতে এসেছিল। ওর নাম তুই যদি বলিস…সুতপা স্তম্ভিত। সুতপা হতবাক।

কাল সকালে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল,

—তুমি সিওর যাদের নাম বলছ তারাই…ভেবে দ্যাখো। আমাকে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে কিন্তু।

কষ্ট করে উত্তর দিয়েছিল সুতপা—আমি কাজল দত্তকে চিনি।

—কাজল দত্তর সঙ্গে তোমার কতদিনের ভাব?

—পাড়ার ছেলে। ছোটবেলায় খেলা করেছি এক সঙ্গে।

—কাজল দত্তর ওপর তোমার রাগ ছিল কোন?

সুতপা থমকে ছিল এ প্রশ্নে। রাগ অভিমান থাকার মত সম্পর্ক কাজলদার সঙ্গে কি থাকার কথা? তবে হ্যাঁ। রাগ তো একটু ছিলই। একটা ছেলে চোখের সামনে নিজেকে নষ্ট করে ফেললে রাগ হয় না? পৃথিবীতে এত ভাল ভাল ছেলে থাকতে সুজয়, পিণ্টুর মত ছেলেদের সঙ্গে…

—পুলিশ অফিসার নতুন করে প্রশ্ন করেছিল,

—কি হল বললে না? তুমি কাজলকে অপছন্দ করতে?

কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল সুতপার। খুব আস্তে মাথাটাকে নেড়েছিল কোনরকমে—হ্যাঁ।

—কাল তো সন্ধে থেকে কারেণ্ট ছিল না রামনগরে। অন্ধকারে তুমি ওদের চিনলে কি করে?

সুতপা চুপ করে রইল। ভদ্রলোক কি বলতে চাইছিলেন? চেনা লোকদের চেনবার জন্য আলোর দরকার হয়! তাছাড়া কাজলদার সঙ্গে তার আগেই দেখা হওয়া…কথা বলা…

—জানো তো একটা ছেলের নামে এ ব্যাপারে ফলস্ অভিযোগ করলে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে? তাছাড়া সুজয়,

পিংকাকে তো তুমি…তোমার মত মেয়ের তো চেনারও কথা নয়…

হিংস্র তীব্র যন্ত্রণায় সুতপা মাথা নাড়তে থাকল দুদিকে। তিনটে হিংস্র পশু মিলে ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার চিহ্ন বহন করছে সে।…আইনের রক্ষক এসে রক্ষা করতে চাইছে সেই জন্তুগুলোকে।…জন্তুগুলো এসে দাপিয়ে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে। ভয় দেখাচ্ছে।

একটানে সুতপা বুক থেকে ফেলে দিল আঁচলটাকে। দুহাতে ছিঁড়ে ফেলল ব্লাউজ। ডুকরে কেঁদে উঠল।

শোভনা পলকে বেডসুইচ টিপেছেন। সুতপা কাঁদতে কাঁদতে মাথা ঠুকে চলেছে বালিশে তখন। চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত। এ মেয়েকে কখনও দেখেননি শোভনা। সজোরে কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন,

—তপু? এই তপু?

তাঁকে প্রায় ছিটকে দিয়ে উঠে বসল সুতপা। মায়ের হাত চেপে ধরে টেনে আনল নিজের শরীরের ওপর। একটা একটা করে ক্ষতস্থান দেখাচ্ছে,

—এগুলো সব মিথ্যে? বলো? বলো?

—কে বলেছে মিথ্যে?

—তবে কেন তোমরা জানোয়ারগুলোর নাম বলতে বারণ করছ?

—কে বারণ করেছে তোকে?

—তোমরা। তোমরা। তোমরা ভয় পাচ্ছ। পুলিশও এসে আমাকে শোভনা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। বুকের কাছে মাথা টেনে এনে শান্ত করার চেষ্টা করলেন,

—আমি বারণ করিনি।

□ ৬ঠা মে সকাল সাতটা □

অনুতোষ উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন,

—কখন হয়েছিল এসব? কবে এসেছিল?

—পরের রাত্তিরেই। দলবল নিয়ে এসেছিল।

—আপনারা আমাকে একবার বলতে পারতেন। এত কাণ্ড

হয়ে গেছে···

—উনি আসলে ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। এমনিতেই তো দিশেহারা অবস্থা। একদম ভেঙে পড়েছেন। কাউকে কিছু জানাতে চাইছেন না। আমি ওনাকে লুকিয়ে···

—লুকিয়ে থাকলে সব কিছু সলভড্ হয়ে যাবে?

—তা নয়। উনি আসলে ভয় পাচ্ছেন যদি ওরা সত্যিই কিছু করে···

—বাকি কি রেখেছে?

শোভনা মাথা নামালেন। বাকি কিছু নেই ঠিকই। তবু অস্তিত্বের মূলে শিকড়টাই বিপন্ন হয়ে পড়লে কে না আতঙ্কিত হয়। শামুককে আচমকা খোঁচা দিলে প্রথমে খোলের ভেতর গুটিয়ে যায় সত্য তবু তারপরও শুঁড় বাড়ানোর চেষ্টা করে। লাঞ্ছনা সহ্য করেও নিজের অস্তিত্বকে জিতিয়ে দিতে চায়। কিন্তু খোলসটাই যদি কেউ ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার ভয় দেখায়। তখন। তখন কি আর সাহস থাকে এগোনোর। প্রিয়ব্রতর এখন যে সেই অবস্থা। শোভনা অনুভব করতে পারছেন। মাত্র তিনটে দিনের মধ্যে কী ভীষণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন মানুষটা। চোখের নিচে কালি। দৃষ্টি দিকভ্রান্ত। সব বুঝেও শোভনা মেনে নিতে পারছেন না কিছুতেই। একদিকে মেয়ের চূড়ান্ত অপমান, জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারানোর প্রশ্ন। অন্যদিকে....

অনুতোষ আবার প্রশ্ন করলেন,—প্রিয়বাবু ব্যাপারটা রিপোর্ট করে এসেছেন থানায়?

শোভনা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন,—কাল গিয়েছিলেন। আমিই পাঠিয়েছিলাম জোর করে। মেয়েটার অবস্থা আর চোখে দেখা যাচ্ছে না।

—পুলিশ কি বলল?

—ওসি আরও ইনভেস্টিগেট না করে অ্যারেস্ট করতে চাইছেন না। শুধু তপুর কথার ওপর নির্ভর করে নাকি ওদের ধরা যায় না। কাজলের ওপর ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ থেকেও নাকি তপু তাদের নাম বলে থাকতে পারে।

—রাবিশ। অনুতোষ প্রায় চিৎকার করে উঠলেন,—কে

বলেছে এসব কথা ? হি শুড অ্যারেস্ট দেম ফার্স্ট। এটাই আইন।

শোভনা দু আঙুলে কপাল টিপে ধরলেন। কালও সারারাত একবারের জন্যও দু চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। প্রিয়ব্রতও জেগে বসেছিলেন ঠায়। রাতভর বাইরে একটা ছোট্ট শব্দ হলেও কাঁটা হয়ে উঠেছেন। বাবলুও বারবার উঠছিল। শুচ্ছিল। কিশোর মনে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। মাকে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন করছে,—কিছু করা যাবে না ? মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে ? বলার সময় ভেতরকার চাপা ক্রোধ স্পষ্ট ফুটে উঠছে মুখে। কখন কি করে বসে কে জানে। একমাত্র মেয়েটাকেই যা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারছেন শোভনা। তাও মেয়ের মুখে যে তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখেছেন তা বুঝি কোন ভাষাতেই বর্ণনা করা যায় না। ভয়ে চুপ করে থাকলে মেয়ে কি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে তাঁদের ? নিজেকেও কি নিজে ক্ষমা করবেন শোভনা ?

অনুতোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শোভনার পাশে থমথম মুখে বসে তাঁর স্ত্রী। সুরমা। ভেতরে যাওয়ার দরজার চৌকাঠে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ঝর্ণা। অনুতোষের হৃৎপিণ্ডটা চমকে উঠল। সুতপা আর ঝর্ণা সমবয়সী প্রায়। সেই থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে। ঘটনাটা সুতপার না হয়ে ঝর্ণারও তো হতে পারত। অস্থির পায়ে জানলার পাশে গেলেন,

—ভয় দেখিয়ে যাওয়ার কথা প্রিয়বাবু থানায় বলেছেন ? শোভনা মুখ তুলে বললেন,—উনি সবই বলেছেন।

—তারপরও কিছু স্টেপ নেবে না পুলিশ। স্ট্রেঞ্জ।

—এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? সুরমা কথা বলে উঠলেন মাঝখানে,—তোমার কি এখনও সন্দেহ আছে নাকি যে ওদের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ? ওসিই [illegible] সঙ্গে কথা বলার পর ওদের সব জানিয়ে দিয়েছে।

—সেজন্যই তো উনি কিছুতেই থানায় যেতে চাইছিলেন না।

অনুতোষ বিচলিত মুখে আবার বসে পড়লেন চেয়ারে,

—ওঁদের সঙ্গে ঠিক কি কি কথা হয়েছে খুলে বলুন তো।

শোভনা আবারও একটা বড় শ্বাস ফেললেন,

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একরকম ওনাকে সাবধান করেছেন ভদ্রলোক। সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গেলে নাকি আমাদের মঙ্গল।

—আর ?

—কাজলদের নাকি প্রচুর ক্ষমতা···এম এল এ-র সঙ্গে খাতির··· বাবলুকে রাস্তায় ঘাটে বেরোতে হবে..কোথায় কখন কি হয়ে যায়···ছেলেটারও তো একটা ভবিষ্যত আছে···উনি তো আর সারা-জীবন পাহারা দিতে পারবেন না···

—তার মানে ভয় দেখিয়েছে ? কিছুই করবে না ? তাই তো ?

—ভদ্রলোক নাকি কথা প্রসঙ্গে হা হুতাশও করেছেন অনেক। আজকাল নেতাদের চাপে পড়ে পুলিশ নাকি কাজ করতে পারে না···নাকের ডগা দিয়ে অপরাধীরা ঘুরে বেড়ায়···চাকরি বাঁচানোর জন্য পুলিশকে···

—বাহ্। সেইজন্য ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে এ্যালার্ট করে দিয়েছেন গুণ্ডাগুলোকে! চমৎকার। রক্ষকই ভক্ষক।

সুরমা বললেন—কিছু হবে না। যে সমাজে বাস করি সেখানে এর থেকে বেশি কি আশা করতে পারি আমরা ?

—তা বলে চুপ করে থাকতে হবে ?

—আমার তো মনে হয় সেটাই ঠিক কাজ হবে। কি দরকার ঘাঁটাঘাঁটি করার ? তপুটা ভালয় ভালয় সুস্থ হয়ে উঠুক···

—কখখনো না। ঝর্ণা সহসা কথা বলে উঠেছে—আমাদের মান সম্মানের কোন দাম নেই ? ওদের এভাবে বাড়তে দিলে যা খুশি তাই করবে এর পর যে কোন মেয়েকে যখন তখন···

—ঠিক বলেছিস। অনুতোষের মুখ লাল হয়ে উঠল। —সবাই ভেবেছেটা কি ? দেশে আইন কানুন বলে কিছুই নেই ? আমরা এম এল এ-র কাছে যাব। দরকার হলে মিনিস্টার, চিফ মিনিস্টার। খবরের কাগজে ফ্ল্যাশ করব সব। আর এই ওসির আমি খবর নিচ্ছি। আজই এস পি-র সঙ্গে দেখা করব। ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার বাবারও বাবা আছে।

সুরমা আচমকা বলে বসলেন—দ্যাখো আমার মনে হয় কিছু করার আগে আরও ভালভাবে চিন্তা করা দরকার। তুমি একা এগোলে ওরা তোমার পেছনেও লেগে যেতে পারে। তোমাকেও

এখানে বাস করতে হবে। তোমারও একটা মেয়ে আছে।

কথাটায় পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে। শোভনা অস্বস্তি বোধ করলেন। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করে উঠল। অনেক আশা নিয়ে সাতসকালে অনুতোষবাবুর কাছে ছুটে এসেছেন। প্রিয়ব্রত যেরকম ভেঙে পড়েছেন তাঁকে নিয়ে আর এক পাও এগোন যাবে না। কাল থানা থেকে ফেরার পর সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ একটা। বাড়িতে ঢুকেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—বাবলু…বাবলু…?

—কি হয়েছে?

—বাবলু কোথায়?

—কোথায় আবার। ঘরেই। দুদিন ধরে ওকে বাইরে বেরোতে দেখেছ?

—বেরোবে না। এক পা ও যেন না বার হয় বাড়ির থেকে।

বলতে বলতে হাঁপাচ্ছেন ভীষণভাবে। দরদর করে ঘামছেন। চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ করে। দেখতে দেখতে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাঁ করে শ্বাস টানছেন।

শোভনা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন খুব। তাড়াতাড়ি জল এনে ছিটিয়ে ছিলেন মানুষটার মুখে। ছেলেকে ডেকেছিলেন।

—এই বাবলু। তাড়াতাড়ি একবার আয় দেখি।

অনেকক্ষণ পর কথা বলেছিলেন প্রিয়ব্রত,

—শোন, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

—কি?

—কালই অফিস গিয়ে কলকাতায় বাড়ি দেখছি। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে চলে যাব। পারলে দু-চার দিনের মধ্যেই।

—বাড়িটার কি হবে?

—বেচে দেব। আত্মীয়স্বজন কাউকে কিছু জানানোর দরকার নেই। অন্য কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্তে তপুর বিয়ে দিয়ে দেব আগে। বাবলুও রেজাল্ট বেরুলে ভাল কোথাও ভর্তি হয়ে যেতে পারবে।

কী সহজ সরল সমাধান। নিশ্চিন্ত পলায়ন। পালিয়ে গেলেই যেন সব দাগ মুছে ফেলা যায়। একবার প্রিয়ব্রত বুঝতে চাইছেন না তাঁর আদরের মেয়ে এখন ঝুলছে অস্তিত্বের শেষ সীমারেখায়।

প্রিয়ব্রতর মত সুরমাও পালিয়ে থাকতে চাইছেন। এ পালানোর চেহারা অবশ্য অন্য। এটুকু জানেন না প্রতিটি মধ্যবিত্তের বাড়ি কাঁচের বাড়ি। আত্মসম্মানের কাঁচ। ঢিল মেরে একটা বাড়ি কেউ ভেঙে দিলে অন্য একটা কাঁচের বাড়িতে উটপাখির মত মুখ বুজে বসে থাকা হয়ত যায়; লাভ হয় না। একটা ঢিল মেরে যে আনন্দ পেয়েছে সে দ্বিতীয় ঢিলও মারতে পারে।

কথাগুলো মনে মনে ভাবলেও শোভনা অবশ্য মুখ ফুটে বললেন না কিছুই। চৌকি ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

অনুতোষও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে—চিন্তা করবেন না। রাস্তা একটা খুঁজে বার করবই। এভাবে চলতে পারে না।

শোভনার চোখে জল এসে গেল। দাঁতে ঠোঁট চেপে মাথা নাড়লেন—আসি এখন।

শোভনা চলে যাওয়ার পর অনুতোষ ফেটে পড়লেন রাগে

—ওদের ওরকম বিপদের সময় ওভাবে কথা বলতে তোমার খারাপ লাগল না? ছিঃ।

কথাটা বলে ফেলে সুরমারও যে খারাপ লাগে নি তা নয়। তবু তর্কের খাতিরে বলে উঠলেন—ঠিকই বলেছি। আমরা কেন আগ বাড়িয়ে হাঁড়িকাঠে মাথা দিতে যাব? আরও অনেক লোক আছে পাড়ায়।

—থাকতে পারে। কিন্তু বিপদে পড়ে আমাদের কাছেই যখন এসেছে, আমরা মুখ ঘুরিয়ে নেব? তুমি না বলো শোভনা তোমার খুব বন্ধু?

সুরমা এ কথার উত্তর দিলেন না।

অনুতোষ নিজের মনে বলে চললেন—এত বড় একটা অন্যায়… যারা দোষ করেছে তারা চোখের সামনে বুক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে…

—সে তো সব সময় ঘোরে। সুরমা আরও কঠিন সত্যটা বলে ফেললেন এবার—তোমরাই তো এদের বেড়ে উঠতে দিয়েছ। গতবার ইলেকশনের আগে দু-দুটো ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হল। কারা করেছিল? ওয়াগন ব্রেকিং, রাহাজানি, ছিনতাই, বোমাবাজি যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে এরাই। মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে

না। তোমরা এ সবের প্রতিবাদ কেউ করেছ কোনদিন ?

অনুতোষ চুপ করে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। এ কথার উত্তর তাঁর কাছে নেই। আজকে প্রতিবাদ না করাটা যেমন অন্যায়, অন্য সময় প্রতিবাদ না করাটাও ঠিক ততটাই অন্যায়। প্রথম থেকে সকলে মিলে প্রতিবাদ করতে পারলে এখনকার ঘটনাটা হয়ত ঘটতই না। তাঁদেরই নিষ্ক্রিয়তায় একটু একটু করে বেড়ে ওঠে কাজলরা। মেয়েটা চুপ করে তাকিয়ে আছে তাঁদের দুজনের দিকে। অনুতোষ তার মাথায় গিয়ে হাত রাখলেন। বুঝতে পারছেন কিছু একটা বলা উচিত। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

৪ঠা মে দুপুরে দুটো

ছেলে দুটোর বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে। একজনের চোখে চশমা। চাপ দাড়ি। নীল রঙের শার্ট আর ঘিয়ে প্যান্ট পরেছে সে। অন্যজন পাজামা পাঞ্জাবি পরা। ফর্সা। সাধারণের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা। প্রিয়ব্রত দরজা অল্প ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই ?

—এটা কি সুতপা বসুর বাড়ি ?

দরজার ফাঁকটা আরও সরু করে দিলেন প্রিয়ব্রত.

—কেন বলুন তো ?

চাপ দাড়ি উত্তর দিল,—আমরা রামনগর বার্তা থেকে আসছি। আপনাদের কাছে কয়েকটা কথা জানার ছিল।

পলকে পেছন ঘুরে দেখে নিলেন প্রিয়ব্রত। একটু আগে শোভনা খাওয়া-দাওয়া সেরে মেয়ের পাশে গিয়ে শুয়েছেন। খাওয়া বলতে দুমুঠো কোনভাবে নাকে মুখে গোঁজা। কদিন ধরে বাড়ির কে'ই বা খেতে পারছে ভাল করে। তবুও খেতে হয়। খিদেও পায় সময়মত। শরীরের এ এক আশ্চর্য চাহিদা।

যতটা সম্ভব গলা নিচু করলেন প্রিয়ব্রত। কোনভাবেই যেন বাইরের ঘর পেরিয়ে শব্দ ভেতরে না যায়।

—কি জানতে চান ?

ছেলে দুটো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সেকেন্ডের জন্য। লম্বা

ছেলেটি কথা বলেছে পরক্ষণেই,

—আমরা কি একটু ভেতরে যেতে পারি ?

ছেলে দুটোর মুখের ওপর সহজেই না বলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায়। তারপর ? যদি আবারও আসে ? যদি বাবলু কিম্বা শোভনার সঙ্গে কথা হয়ে যায় ? সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না প্রিয়ব্রতর। মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিলেন ভাল করে। ভরদুপুরে এ সময় পাড়া নির্জনই থাকে। আশপাশের বাড়িগুলোকে এক মনে চেটে চলেছে বৈশাখের রোদ। উল্টোদিকে ব্যানার্জিবাবুদের জানলায় চোখ আটকে গেল। ব্যানার্জিবাবুর ছেলের বউ কৌতূহলী চোখে পর্দা সরিয়ে এদিকেই দেখছে। সুতপাকে নিয়ে আসার পর পাড়াপ্রতিবেশীর আসা একটু কমেছে। কেন আসছে না ? নেহাতই ভদ্রতাবোধ ? নাকি অকারণ ঝামেলায় কেউ জড়াতে চায় না নিজেকে ? ভালই হয়েছে অবশ্য। প্রিয়ব্রত বাইরে বেরিয়ে দরজার পাল্লাদুটোকে আস্তে টেনে দিলেন। সাবধানে।

—ভেতরে বসার একটু অসুবিধে আছে। যা জিজ্ঞাসা করার এখানেই করুন।

ছেলে দুটো আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে। চাপ দাড়ি বিনীতভাবে বলে উঠল—আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা আপনার মেয়ের নাম খবরে উল্লেখ করব না। আমরা শুধু কাগজে ঘটনাটার তীব্র নিন্দা করতে চাই। দিনদিন যেভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়ে চলেছে…

—কি জানার আছে ? প্রিয়ব্রত অধৈর্য হলেন। নিজের অজান্তে চোখ বারবার চলে যাচ্ছে ব্যানার্জিবাবুর জানলার দিকে।

—আপনি নিশ্চয়ই সুতপা দেবীর বাবা ?

প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়লেন।

—আমরা পরশুদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি বণ্ড দিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছেন। লম্বা ছেলেটির স্বর যথেষ্ট ভদ্র।

—ঠিকই শুনেছেন। প্রিয়ব্রত উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি করে নিলেন নিজেকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ছেলে দুটোকে বিদায়

করতে হবে।

—আপনি যদি অনুমতি করেন তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করার ইচ্ছে ছিল। কথা দিচ্ছি একটাই শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

—না। প্রিয়ব্রত আঁতকে উঠলেন প্রায়—ওর শরীর খুব খারাপ। যা জানার আমার কাছ থেকেই জেনে নিন।

—উনি কি কালপ্রিটদের কারুর নাম বলতে পেরেছেন ?

—না। এখনও সেরকম মানসিক অবস্থা আসে নি।

—হাসপাতালে ওসি নিজে গিয়েছিলেন শুনলাম। তখনও কি…?

—হ্যাঁ। তখনও কথা বলার মত অবস্থা ছিল না।

ত্রিশ তারিখ ঠিক কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল ?

—নটা সাড়ে নটা হবে।

—উনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

—পড়াতে গিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য দেরি হয়ে যায়।

—ওই নোংরা কাজে কজন ছিল কিছু জেনেছেন ?

—না।

—পুলিশ এ ব্যাপারে কি স্টেপ নিয়েছে ?

—বলতে পারব না।

—পুলিশ কি আপনাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে বলে আপনার মনে হয় ?

এবার প্রিয়ব্রত মিথ্যা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছনে শব্দ পেয়ে থমকে গেলেন। বাবলু কখন এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রিয়ব্রত একরকম ধাক্কা দিয়েই ছেলেকে ঢুকিয়ে দিলেন ঘরে। দিয়েই ছেলে দুটোর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—তোকে কে বাইরে বেরোতে বলেছে ?

বাবলু যেন শুনেও শুনল না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

—ওরা কারা ?

—তোর জানার কি দরকার ?

বাবলু তবু প্রশ্ন করল,—তুমি ওদের সত্যি কথা বললে না কেন ?

প্রিয়ব্রত চিৎকার করে উঠলেন—বেশ করেছি। তোকে কে পাকামি করতে বলেছে? বারণ করেছি না কারুর সামনে বেরোবি না?

চিৎকারটা একটু জোরেই হয়ে গেছে কি? নইলে শোভনা কেন ছুটে এল শোবার ঘর থেকে?

—কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

—কি হয়েছে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো।

—জিজ্ঞাসা করার কি আছে? প্রিয়ব্রতর গলা আরও উঁচুতে উঠল—যে কেউ যখন তখন বাড়িতে এলেই ভ্যাকভ্যাক করে সব কথা বলে দিতে হবে তাকে? ওরা ওদের লোকও হতে পারে। হয়ত পরীক্ষা করে দেখতে এসেছিল আমাদের।

শোভনা অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন দুজনের দিকেই,

—কাদের লোক এসেছিল! কখন এসেছিল!

প্রিয়ব্রত সোফায় বসে পড়লেন। নিজের চকিত উত্তরে নিজেই ভয় পেয়ে গেছেন। ছেলে দুটো যে কাজলদের লোক হতে পারে কথাটা এক সেকেন্ড আগেও মাথায় আসেনি। হতেও তো পারে! প্রিয়ব্রতর সারা শরীর কেঁপে উঠল নতুন করে। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

বাবুল কিছু বলতে যাচ্ছিল, শোভনা ইশারায় বারণ করলেন ছেলেকে। স্বামীর পাশে এসে নরম গলায় বললেন—জানি না কে এসেছিল। কেনই বা এসেছিল। তবে একটা কথা তোমাকে বলে দিতে চাই।

প্রিয়ব্রত হাত সরালেন না মুখ থেকে।

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি। কিছুতেই আমরা হার স্বীকার করে নেব না। যা হয় হবে। কালকেই এম এল এ-র সঙ্গে আমি নিজে গিয়ে দেখা করব।

—তোমাকে শক্ত হতেই হবে।

প্রিয়ব্রত তবু কাঁপছেন ভীষণ।

শোভনা এবার হাত রাখলেন তাঁর কাঁধে—ওঠো। তপুর কাছে গিয়ে একটু বসবে চলো। তুমি না সাহস দিলে মেয়েটা জোর পাবে কোথ্থেকে?

লোকটা ডাকল,—আসুন। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

বেশ বড় ঘরটার দুদিকে দুটো লম্বা সোফা টানা পাতা। ভেতরের দিকের দেওয়াল ঘেঁসে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপাশে সিংহাসনের মত বিরাট এক চেয়ার ছাড়াও তিনদিকে খান কয়েক এমনি চেয়ার সাজানো রয়েছে। এদিকেও, সোফা দুটোর এ প্রান্তে, জানলার দুপাশে আরও কিছু চেয়ার। সেই চেয়ারগুলোর একটাতেই বসতে যাচ্ছিলেন অনুতোষ, লোকটা বাধা দিল,

—না, না। ওখানে না। এখানে বসুন। সোফায়।

অনুতোষের সঙ্গে শোভনা, প্রিয়ব্রতও বসলেন সোফায়। আড়ষ্টভাবে। শোভনা হালকা সবুজ রঙ করা দেওয়ালগুলোর গায়ে চোখ বোলালেন কয়েক সেকেণ্ড। দেওয়ালে পরপর ছবির লাইন। দেশনেতার, মনীষীদের। দেশী, বিদেশী। এক দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরের ছবিহীন লাল সাদা ক্যালেণ্ডার।

অনুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন,

—উনি নামবেন কখন ?

—নামবেন। সময় হয়ে গেছে। লোকটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখল। এক গোছা চিঠি উল্টে পাল্টে দেখে চাপা দিল পেপার ওয়েট দিয়ে,

—আসলে রমেনদা কাল অনেক রাত্রে ফিরেছেন তো···মে ডে উপলক্ষে আসানসোলে বড় একটা লেবার কনফারেন্স হল। সেটা অ্যাটেন্ড করতে বেরিয়েছেন সেই তিরিশ তারিখ বিকেলে। খুব ধকল গেল কদিন।

—ও। অনুতোষ মাথা নাড়লেন।

রমেন সিংহ দীর্ঘদিন এ অঞ্চলের সিটিং এম এল এ ছাড়াও খুব নাম করা লেবার লিডার। সারা পশ্চিম বাংলার প্রায় সব বড় বড় কলকারখানার মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। কোথাও সভাপতি। কোথাও উপদেষ্টা। প্রচণ্ড জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে পারেন। শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এক সময় এই বক্তৃতা দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকদের এককাট্টা করেছেন। মালিকপক্ষের

চক্ষুশূল হয়েছেন। পঁচাত্তরে, এমারজেন্সির সময় জেল খেটেছিলেন। তখন রামনগরের এত রমরমা কোথায়। রামনগরের মানুষ রমেন সিংহ তখন থাকতেন স্টেশনের ধারে একটা ভাড়া বাড়িতে। সাতাত্তরের ইলেকশনে প্রথম পার্টির টিকিট পেলেন। সেই থেকে তেরো বছর ধরে রামনগরেরই বিধায়ক। রামনগরের এত উন্নতি, কলকারখানা সব কিছুর পেছনে এই মানুষটার অবদান কেউই অস্বীকার করতে পারে না। রামনগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটারও যে উন্নতি হবে, সে তো স্বাভাবিক। ধুতি শার্ট ছেড়ে দামি প্যান্ট শার্ট পরেন এখন। বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। স্টেশনের ধারেই বছর পাঁচেক হল দোতলা বাড়ি তুলে ফেলেছেন। বাড়িরই একটা অংশ দিয়েছেন পার্টি অফিসকে। অনুতোষের সঙ্গে এককালে ভালই পরিচয় ছিল। সেও প্রায় বছর দশেক আগের কথা। এর মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। এখন চিনতে পারবেন কি না কে জানে! অনুতোষ একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

লোকটা ঘরের কোণার দিকের টেবিলে গিয়ে কি সব লিখছে। একে আগে দেখেননি অনুতোষ। মনে হয় এক নম্বর মো সাহেব। আজকাল নেতাদের পাশে এরকম অসংখ্য স্যাটেলাইট ঘুরছে। এরা কথা বলে বেশি। শোনে কম। এই যেমন এখনই লোকটা লেখা শেষ করে কোণায় বসা রোগামতন যুবকটির সঙ্গে অনর্গল কথা শুরু করেছে। ছেলেটিও মুগ্ধ শ্রোতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে।

—হ্যাঁ রে। সুভাষ পল্লীর জমির কেসটা কি হল রে শেষ পর্যন্ত?

ছেলেটি কি একটা উত্তর দিতে গেল, তার আগেই লোকটা বলে উঠেছে—রমেনদা আমাকে নিজে ওই কেসটার ভার দিয়েছিলেন বুঝলি। অনেক কিচাইন আছে...আমার মনে আছে আগেরবার সেই ধান কাটার ডিসপিউট নিয়ে শালা শুঁটে ভট্‌চায্‌ হেভি ডাউন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল...এবারও শালা....

লোকটার কথার মধ্যেই আরও জনা চারেক লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে। ঢুকেই সোফায় বসে পড়েছে। সকলেই রমেন সিংহর

দর্শনার্থী। রামনগরে থাকলে, নিয়ম করে রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক এলাকার মানুষের কথা, অভিযোগ শোনেন রমেনবাবু। এটা তাঁর আগেকার পুরনো অভ্যাস।

—শোভনা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এত লোকের সামনে সব কথা বলা যাবে তো।

অনুতোষ ভুরু ওঠালেন—দেখি দরকার হলে…

অনুতোষের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন রমেন সিংহ। হাসিহাসি মুখে সকলের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর ধীরে সুস্থে গিয়ে বসলেন গদিমোড়া বড় চেয়ারে। বসেই অনুতোষের দিকে তাকিয়ে আলাদাভাবে হেসেছেন,

—কি খবর? ভাল?

অনুতোষ হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার জানালেন,

—আপনার কাছে একটু বিশেষ দরকারে এসেছি।

বক্তৃতাবাজ লোকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে রমেনবাবুর পাশে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব নিচু স্বরে কি যে বলছে। রমেনবাবু ঘুরে তাকালেন। তাঁদেরই দেখছেন। ভুরু কুঁচকে ঘনঘন মাথা নাড়লেন। প্রিয়ব্রত খুবই সংকুচিত বোধ করলেন। লোকটা তাঁদের এখানে আসার কারণ মনে হয় ভালমতই জানে। এতক্ষণ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি কিছু।

লোকটার সঙ্গে কথা শেষ করে রমেনবাবু হাতের ইশারায় তাঁর সামনের চেয়ারগুলোতে এসে বসতে বললেন অনুতোষদের।

ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে শোভনা নতুন করে মাথায় আঁচল ওঠালেন। মনে মনে কথাগুলোকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন আপ্রাণ।

অনুতোষ ঝুঁকলেন সামান্য—ইঁনি আমার বন্ধু প্রিয়ব্রত বসু। ইঁনি এনার স্ত্রী শোভনা বসু…

রমেনবাবু শোভনার দিকেই তাকালেন সোজাসুজি,

—বলুন। কি ব্যাপার?

শোভনা বার দুয়েক ঢোঁক গিললেন। কথা শুরু করতে অস্বস্থি হচ্ছে প্রথমটা।

—আপনি বোধহয় শুনেছেন ত্রিশ তারিখ রাত্রে সুতপা বসু বলে একটি মেয়েকে···

—দাঁড়ান। রমেনবাবু কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিয়েছেন শোভনাকে। উঠে দাঁড়িয়েছেন—আপনারা আমার সঙ্গে এ ঘরে আসুন।

বড় ঘরের পাশেই ছোট ঘর অ্যান্টি চেম্বার। এখানেও টেবিলে দুখানা টেলিফোন। চিঠিপত্র কাগজ সব সাজানো কাঁচের ওপর। অনুতোষরা চেয়ারে বসার পর রমেনবাবু এবার প্রিয়ব্রতর দিকে তাকালেন,

—আপনি মেয়েটির বাবা?

প্রিয়ব্রত আরেকবার নমস্কার জানিয়ে বললেন—হ্যাঁ।

—ঘটনাটা আমি শুনেছি। রমেনবাবুর মুখে চকিতে সহানুভূতির ভাব—বিশ্বাস করুন আমার সমবেদনা জানানোর কোন ভাষা নেই। এমন একটা জঘন্য কাজ—আমি নিজেই আপনাদের ওখানে যাব ভেবেছিলাম···এমন বিশ্রীভাবে অকুপায়েড হয়ে গেলাম···কেমন আছে এখন মেয়ে।

প্রিয়ব্রত ঠিক এতটা আশা করেন নি। কৃতজ্ঞতায় চোখ ভরে এল। শোভনা উত্তর দিল,

—খুব দুর্বল। শরীরের থেকেও মনে বেশি আঘাত পেয়েছে। বাড়িতে নিয়ে এসেছি।

—আমি একদিন যাব। মেয়েকে বোঝাবেন ভেঙে পড়ার কিছু হয় নি। ওর রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য কিছু দরকার হয় নিশ্চয়ই....

—আমরা ঠিক সেজন্য আপনার কাছে আসিনি। স্পষ্টভাবে বললেও শোভনার গলা সামান্য কেঁপে গেল।

রমেনবাবু থমকালেন একটু। পকেট থেকে ফিলটার উইলসের প্যাকেট বার করলেন। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। প্রথম ধোঁয়াটা ভাসিয়ে দিয়ে হেলান দিলেন চেয়ারে,

—হ্যাঁ বলুন।

সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে কি আত্মরক্ষার বর্ম তৈরি করলেন ভদ্রলোক? সময় নেওয়ার ভঙ্গি দেখে অনুতোষের ঠিক প্রশ্নটাই মনে এল। শোভনা বা প্রিয়ব্রত কারুরই অত লক্ষ করার মত মানসিক

অবস্থা নেই। প্রিয়ব্রত তো চুপ করে বসে আছেন। জড়োসড়ো ভাব এখনও। শোভনাই কথা বললেন—

—আমার মেয়ে হসপিটালে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে কালপ্রিটদের নাম বলেছে।

রমেনবাবু পিঠ টান করলেন—তাই নাকি? কারা তারা?

—কাজল দত্ত আর পিন্টু, সঞ্জয় বলে দুটো ছেলে। কাজল দত্তরই বন্ধু। ভদ্রলোক মুহূর্তের জন্য চুপ থেকেই বলে উঠেছেন।

—পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করেছে তো?

অনুতোষ কথা বললেন এতক্ষণে—না। করেনি। সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। কাজল দত্ত এঁদের বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেছে। প্রাণের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে।

—আপনারা পুলিশকে সে কথা জানিয়েছেন?

প্রিয়ব্রতও কথা বলার সাহস পেলেন এবার,

—জানিয়েছিলাম। তারা বলল আমার মেয়ে নাকি সঠিকভাবে নাম বলতে পারেনি। মিছিমিছি গুন্ডাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে গেলে নিজেদেরই…

—তাছাড়া কাজল দত্ত যে এঁদের ভয় দেখিয়েছে পুলিশের মতে তার তো কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। রেকর্ড নেই। অনুতোষ প্রিয়ব্রতর কথা কেড়ে নিয়ে নিজেই গুছিয়ে বলার চেষ্টা করলেন—আসলে ওরা যে কোন কারণেই হোক স্টেপ নিতে চাইছে না। কাজল দত্তর নাকি পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট…

—সে কি? গুন্ডাদের সঙ্গে পলিটিক্সের কি সম্পর্ক? রমেনবাবু হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—এ সব কি কথা? পুলিশের তো তাদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল… যত সব লুম্পেন, বদমাইশ…দাঁড়ান দেখছি। এক সেকেন্ড বসুন তো।

অনুতোষ প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে তাকালেন। প্রিয়ব্রত শোভনার দিকে। পাশের ঘর থেকে রমেনবাবুর উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে। বেশ জোরে কথা বলছেন ফোনে। ও সি-র সঙ্গে।

—না না… আমার পার্টির ছেলে ফেলে না… মেয়েটির বাবা

মা আমার কাছে এসেছেন···হ্যাঁ। আপনি এখখুনি অ্যারেস্ট করুন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছি তো। অ্যারেস্ট করুন। ···না আমি চিনি না। ওরকম ইলেকশনের সময় কত এলিমেন্টই তো এসে ভেড়ে।

—এভাবেই আপনারা আমাদের বদনাম করে দিচ্ছেন। আমাদের পার্টির একটা ইমেজ আছে···বলতে বলতে গলা আস্তে হয়ে গেল। আর কথা শোনা যাচ্ছে না। একেবারে শেষটুকু শুধু কানে এল,

—ইমিডিয়েটলি! ইমিডিয়েটলি। এ ব্যাপারে আমি আর আপনাদের ডি এম বা এস পি-কে ফোন করতে চাই না।

ফোন রেখে ঘরে ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন আয়েস করে—বলে দিয়েছি। আর চিন্তা করবেন না। আপনাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না। ···আসলে ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিশে এমন একটা সিস্টেম চলে আসছে··· তার পরিণতি আজ এই। করাপশন। নোংরামির চূড়ান্ত। ঘাড় চেপে না ধরলে কাজ করতে চায় না। তার ওপর এই সব লুম্পেনদের সঙ্গে মাখামাখি··· আমরা কত ভিজিলেন্স রাখব বলুন?....কতটা আর দূর করতে পারি!

প্রিয়ব্রতর বুক থেকে হাজার মনী বোঝা নেমে গেল যেন। অনুতোষেরও মুখ উজ্জ্বল! রমেন সিংহর মধ্যে তাহলে এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে! সবটুকু বিকিয়ে যায়নি! ঠিক। ন্যায়বোধ। অথচ কাজলরা এঁকে খুঁটি করেই··· ! অনুতোষ বলেই ফেললেন,

আমি জানতাম আপনার কাছে এলে কাজ হবেই। ওরা মিছিমিছি আপনার নাম দিয়ে···

—আপনারাই দেখুন। রমেনবাবু আরেকটা সিগারেট ধরালেন,

—আমাদের পেছনে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে বুঝলেন! পুলিশ। আমলা। অপোজিশনের কথা বাদই দিলাম। তাদের তো কোন ক্যারেক্টারই নেই। কি করেছি কেউ দেখে না। কি করিনি···

দিব্যি মেজাজে বক্তৃতা শুরু করেছেন ভদ্রলোক, শোভনা ফস করে বলে উঠলেন,

—তাহলে আপনি বলছেন ওরা অ্যারেস্ট হবেই? পুলিশ ধরবে?

—অফ কোর্স ধরবে। চাকরির ভয় নেই?

—শোভনার তবু শংকা যায় না—আমার ছেলের কোন বিপদ হবে না তো? একেবারেই বাচ্চা···

—কিছু হবে না। আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি তো রয়েছি। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন। আমি আপনাদের দেখাশুনো করব না? নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান। মেয়েটাকে আগে স্বাভাবিক করে তোলা দরকার।

আরেকবার করে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনজন বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা থেকে নামার পর ছোট্ট একটু খোয়া বাঁধানো রাস্তা। তারপরে গেট। মাথার ওপর দিয়ে দুটো টুনটুনি উড়ে গেল। এখনও এদিকে নানারকম পাখি দেখা যায়। অনুতোষ বোগেনভিলিয়া গাছটার সামনে এসে সিগারেট দিলেন প্রিয়ব্রতকে। শোভনা এগিয়ে গেলেন।

—নিন। মন হাল্কা করে টান দিন এবার।

প্রিয়ব্রতর মুখে স্বস্তির হাসি—এভাবে কাজ হয়ে যাবে ভাবিনি। কাজল যার জোরে এত মস্তানি করে বেড়ায়···

—ফুকো মস্তানি সব। রমেনবাবুরা ওদের কেন প্রোটেকশন দেবেন? বলেই গলা উঠিয়েছেন। শোভনাকে ডাকছেন।

শোভনা গেট পেরিয়ে ঘুরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেছে। রমেনবাবুর দোতলার জানালা থেকে কে সরে গেল টুক করে। শোভনা পাথর হয়ে গেলেন। মুহূর্তের জন্য দেখলেও চিনতে ভুল হয়নি। কাজল।

☐ এই যে বেলা সাড়ে দশটা ☐

রিক্সা থেকে নেমে সোজা ডি এম-এর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন অনুতোষ। আর্দালি দরজা আটকে দাঁড়াল,

—কোথায় যাচ্ছেন?

অনুতোষ কটমট করে তাকালেন—ভেতরে।

—এভাবে ঢুকবেন না। পাশের ঘরে পি এ-কে গিয়ে স্লিপ দিন আগে।

—হেল উইথ ইওর স্লিপ। অনুতোষ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন লোকটাকে। সজোরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই ফেটে পড়েছেন,

—কি ভেবেছেন আপনারা আমাদের অ্যাঁ? পাঁঠা? ছাগল? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাচ্ছেন? হেড অফ ডিস্ট্রিক্ট? ফুঃ।

ডি এম উঠে দাঁড়ালেন। বয়স বেশি নয়। ত্রিশের একটু ওপরে হবে হয়ত। ঝকঝকে সুন্দর চেহারা। মুখ চোখে আলগা একটা আভিজাত্যের ছাপ। উঠে দাঁড়িয়ে অবাক মুখে তাকিয়েছেন,

—কি ব্যাপার? কে আপনি? এভাবে ঢুকে পড়েছেন কেন? আর্দালি ছাড়াও আরও দু-তিনজন ভেতরে এসে চেপে ধরল অনুতোষকে,

—বাইরে, চলুন। চলুন।

—কিছুতেই যাব না। যা বলবার বলব, তারপরে যাব। অনুতোষ দুহাতে প্রাণপণে লোকগুলোর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন—গায়ে হাত দেবেন না। আমি এখানে ভিক্ষে করতে আসি নি। চুরিও না।

তরুণ ডি এম সামনে এগিয়ে গেলেন। অনুতোষের চেহারা দেখে থতমত খেয়েছেন সামান্য।

—কে আপনি? কোথ্‌থেকে আসছেন?

—আই অ্যাম আ স্কুল টিচার। আমি এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ইয়েস্। এখনই।

—ঠিক আছে। আপনারা যান। ডি এম লোকগুলোকে বাইরে যেতে বললেন। অনুতোষকে বসতে বললেন চেয়ার দেখিয়ে,

—বসুন। প্লিজ।

—আমি বসতে আসি নি।

—ও কে। কুল ডাউন দেখি। এত এক্সসাইটেড থাকলে আপনি কথা বলবেন কিভাবে?

অনুতোষ নিশ্বাস ফেললেন জোরে জোরে। ট্রেন থেকে নেমে প্রচণ্ড রোদে হেঁটে এসেছেন। ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকেও সেই উত্তাপ

জড়িয়ে আছে গায়ে। মাথার পেছনে শিরা দপদপ করে চলেছে একভাবে। সারা শরীর জ্বলছে। ঘামে ভিজে পাতলা পাঞ্জাবি লেপটে গেছে শরীরে।

ডি এম বেল বাজিয়ে এক গ্লাস জল দিতে বললেন। দাঁতে দাঁত চেপে রাগটাকে সংযত করার চেষ্টা করলেন অনুতোষ। চেয়ার টেনে বসলেন সোজা হয়ে।

—বলুন এবারে।

—আপনারই জুরিসডিকশনের মধ্যে তিনটে গুন্ডা একটি মেয়েকে বীভৎসভাবে রেপ করেছে। ডু ইউ নো দ্যাট?

ডি এম চমকে উঠলেন—কোথায়? কবে? কোন জায়গায়?

—দেখুন, আপনি খবর রাখেন না। অথচ এই ডিস্ট্রিক্টের ল অ্যান্ড অর্ডার দেখার কথা আপনারই।

ডি এম আবার বেল বাজালেন—দাসবাবুকে ডাকো।

অনুতোষ হাত নাড়লেন—ডেকে লাভ নেই। বুঝতে পারছি ওটা আপনার রেকর্ডেই আসেনি এখনও। টোটাল সাপ্রেশন অফ…

—আই অ্যাম সরি। ডি এম এবার বেশ বিব্রত হয়েছেন—আপনি খুলে বলুন আমাকে। বাই দি বাই, মেয়েটি আপনারই?

—না। আমার প্রতিবেশীর। তবে যে কোন দিন আমার মেয়েও ভিক্টিম হতে পারে।

—আপনি সত্যি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তরুণ ডি এম আলগা হাসলেন—আমাকে না জানানো হলে আমি জানব কি করে?

—রামনগরের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—ত্রিশ তারিখ বৃষ্টি আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তিনজন অ্যান্টিসোশাল জানোয়ার মেয়েটাকে—মেয়েটা টিউশনি করে ফিরছিল। ভদ্রঘরের ভাল মেয়ে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ডি এম আঙুল তুললেন,—এরকম একটা খবর এসেছিল বটে। রামনগর। রাইট। কিন্তু মেয়েটি তো কারুর নাম বলতে পারে নি। এখনও ইনভেস্টিগেশন চলছে।

—বাজে কথা! রামনগর থানার ও সি-কে প্রত্যেকটি গুন্ডার নাম সে জানিয়েছিল। তারা কোন স্টেপ নেয় নি। শুধু তাই নয়, পুলিশকে মেয়েটি নাম জানানোর পরই, সেই গুন্ডাদের কাছে, আপনাদেরই পুলিশ খবর পৌঁছে দেয়। তারা এসে মেয়েটির বাড়িতে···

—আপনি কালপ্রিটদের নাম জানেন ?

—জানি। অনুতোষ আলগা, মাথা দোলালেন—আপনি তাদের ধরতে পারবেন না। সে ক্ষমতা আপনাদের নেই।

—হু আর সে ?

—তারা আপনাদের শ্রদ্ধেয় নেতা রমেন সিংহর ঘরের পোষা কুকুর। আমি নিজের চোখে তাদের একজনকে রমেনবাবুর শেল্টারে দেখে এসেছি। অনুতোষ দুটো মাত্র বাক্য বলে হাঁপাতে লাগলেন। শোভনার অসহায় মুখটা চোখের ওপর ভাসছে। কোনরকমে দুজনকে রিক্সায় তুলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর সোজা ট্রেন ধরে···

ডি এম ফোন তুললেন—এস পি-কে দিন।

অনুতোষ বুড়ো আঙুল ওঠালেন,—পাবেন না। আমি ওনার অফিস ঘরেই আসছি। উনি কলকাতা গেছেন।

ডি এম তবু ফোনটাকে ধরে কটকট করলেন কয়েকবার। রেখে দিলেন—ঠিক আছে। আমি দেখছি।

অনুতোষ উঠে পড়লেন—একটা কথা বলব ?

—বলুন।

—আপনার বয়স কত ?

—কেন ?

—আপনার থেকে বয়সে আমি অনেক বড়। কয়েক বছরের মধ্যেই রিটায়ার করব। বহুকাল শিক্ষকতা করেছি। আপনার বয়সী অনেক ছাত্র আছে আমার। আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করছি এ চাকরি ছেড়ে দিন। বলতে বলতে হনহন করে চলে গেছেন দরজার দিকে। দরজা পর্যন্ত গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন—কত দূর কি করতে পারবেন জানি না। বাট আই উইল গো টু দা লাস্ট। চুপ করে থাকব না। আর এর মধ্যে যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যায়,

আপনারা একজনও কেউ স্পেয়ারড হবেন না। কথাটা এখখুনি ফোন করে জানিয়ে দিতে পারেন আপনাদের নেতাকে।

ঘর থেকে প্যাসেজ। প্যাসেজ থেকে সোজা রাস্তায় আসার পর দম ছাড়লেন অনুতোষ। শরীর ভেঙে আসছে। আর হাঁটার ক্ষমতা নেই। রিক্সা ডাকলেন।

হু হু করে ছুটে চলেছে রিক্সা। অনুতোষ বহুক্ষণ পর তাকালেন রাস্তার দিকে। একদল ফুলের মত শিশু মায়েদের হাত ধরে ফিরছে নার্সারি থেকে। ডিস্ট্রিক্ট কলেজের ছেলেমেয়েরা চলছে কলকল করতে করতে। আগামী দিনের ভবিষ্যত। এদের মধ্যে থেকেই কেউ হয়ত কাজল হয়ে যাবে। অনুতোষের বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করে উঠল। তবে কি তাঁদেরই ফাঁকি রয়ে গেছে কোথাও? কোথাও দায়িত্ব পালনের অবহেলা? বিপিনবাবুর ছেলেটাও তো এককালে তাঁর কাছে পড়েছে। কি শিক্ষা দিতে পেরেছেন তিনি? কোন্ শিক্ষার ভিত গড়ছেন তাঁরা? নাহ্। ভুল ভাবছেন। শুধু কাজলকে দোষ দিয়ে কি লাভ? পরিবেশ.... পরিজন··· লোভ··· হিংসা···। কাজলরা তো শুধুই শিকার। এই দুর্গন্ধময় ঘুনধরা সমাজব্যবস্থার। এই স্বার্থসর্বস্ব সময়টার। অনুতোষ বিড়বিড় করে উঠলেন,

···মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

কত দিন আগে লেখা কবিতা। জীবনানন্দের। তবু প্রতিটি ছত্র এই মুহূর্তেও কী ভীষণ সত্য।

যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই···

উফ্। অনুতোষ এক হাতে বুক খামচে ধরলেন। হৃৎপিণ্ডটাকে যদি বার করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরা যেত!

রিক্সা থেকে নেমে টলতে টলতে প্লাটফর্মে উঠলেন। টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রেনের জন্য। দেখতে সিগনাল হল। ট্রেন আসছে।

···অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা···

ট্রেনে উঠতে যাবেন তখনই মাথার পেছনে আছড়ে পড়েছে

আঘাত। প্ল্যাটফর্মে লুটিয়ে পড়লেন মুহূর্তে। পৃথিবী দুলে উঠল ভূমিকম্পের মত। অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতেও হৈ হট্টগোল শুনতে পাচ্ছেন! কারা যেন ছুটে পালাচ্ছে। কারা যেন ধরে তুলছে তাঁকে।

—ওই যে পালাচ্ছে···ওই ছেলেগুলো···

—কি হয়েছে মশাই? কি হয়েছে?

—আরে কতকগুলো ছেলে ভদ্রলোকের মাথায় দুম করে একটা লাঠির বাড়ি মেরেই পালাল···ইস্। কতটা মাথা কেটে গেছে।

—ধর ধর। ওই যে। ওই তো সামনের কামরায় উঠে গেল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। রওনা দিল রামনগরের দিকে। অনুতোষ ঝাপসাভাবে টের পেলেন তাঁকে ধরাধরি করে প্ল্যাটফর্মের সিটে শুইয়ে দেওয়া হল। সিটের কোলে ধীরে ধীরে শরীরটাকে পুরো ছেড়ে দিলেন অনুতোষ।

☐ ওই যে ভোররাত্রি ☐

এই শব্দটুকু শোনার জন্য এতক্ষণ কান পেতে ছিল বাবলু। নোটন ভানুদের বলা আছে একদম যেন জোরে আওয়াজ না করে। বিছানায় বসে বাবলু একটুখানি দেখে নিল বাবাকে। ঘুমোচ্ছে। কাল অনেক রাত অবধি অনুতোষ কাকার কাছে ছিল। বাবা মা দুজনেই। বাড়ি এসেও জেগে বসেছিল অনেকক্ষণ। দুটোর পর শুয়েছে। মাথায় বেশ কয়েকটা সেলাই পড়েছে অনুতোষ কাকার। বাবলুর শরীর শক্ত হয়ে গেল। আরেকবার বাবাকে দেখে নিয়ে সাবধানে নেমে এল খাট থেকে।

জানলার বাইরে থেকে ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে ঘরের ভেতর হালকা একটা আলোর আবেশ ছড়িয়ে রেখেছে। সচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায় এ আলোতে। পা টিপে বাবলু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখোমুখি ঘরের দরজায়, পর্দার এপারে নিথর দাঁড়িয়ে দিদি। দেখে মনে হয় অনন্তকাল ধরে এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু কাছে গিয়ে দিদির কাঁধে হাত রাখল। নিঃশব্দে উচ্চারণ করল,—আয়।

বাবলুকে অনুসরণ করে সুতপাও এল বাইরের ঘরে। ভাইকে দরজা খুলে দিল,

—তোরা না ফেরা অবধি আমি কিন্তু খুব চিন্তায় থাকব।

বাবলু ফিসফিস করল—ভাবিস না। আমরা অনেকে আছি।

নোটন ভানু রাস্তার এক পাশে অন্ধকারটুকুতে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু কাছে গেল,

—দাঁড়া। ঋণাদিও কিছু তৈরি করে রেখেছে।

ভানু বলল—আমি নিয়ে নিয়েছি আগেই। ওই তো দ্যাখনা ঋণাদি দাঁড়িয়ে জানলায়।

—অনুতোষ স্যার এখন কেমন আছেন রে?

—জ্বর এসেছে। ভুল বকছেন মাঝে মাঝে।

নোটন, তাড়া দিল---তাড়াতাড়ি আয়। মোড়ে অপেক্ষা করছে সবাই। আলো ফোটার আগেই কাজ সেরে ফেলতে হবে।

বাবলু আকাশের দিকে তাকাল। গাঢ় নীল আকাশে এখনও রাত লেগে আছে। ফটফট করছে তারারা। হাল্কা বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা হয়ে আছে চারদিক। এরকম সময়ে পৃথিবীকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

হাঁটতে হাঁটতে নোটন জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁ রে তপুদির মত নিয়ে নিয়েছিস তো? তপুদির আপত্তি নেই?

—নারে বাবা। বাবলু হাত রাখল নোটনের পিঠে—আমার দিদিকে তোরা চিনিস না। একদম অন্যরকম। সব্বার থেকে আলাদা। বলেই ছোট্ট চাপড় মেরেছে নোটনের কাঁধে—কি বলেছে জানিস?

—কি?

—আশ্চর্য একটা কথা। বলল, প্রথম প্রথম খুব কষ্ট পেয়েছি রে বাবলু। লজ্জা লেগেছে। পরে ভেবে দেখলাম, ওই সব গুন্ডাদের যে কোন অত্যাচারই সমান অপরাধ। তা সে রেপিং হোক। খুন। কিম্বা বুকে ছুরি মারা। তাতে আমি লজ্জা পাব কেন?

ভানু কৃষ্ণচুড়া গাছের কাছে পৌঁছে গেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়া লাগল—কি রে, পা চালাবি তো?

বাবলু ভানুকে ধরে ফেলল—অমিত, শুভ, পিকলু সবাইকে খবর দিয়েছিলি? আসবে সবাই?

—আয় না। দেখবি কতজনকে জোগাড় করে ফেলেছি।

সত্যিই জোগাড় করেছে ভানু। বড় রাস্তায় এসে বাবলুর প্রায় চক্ষুস্থির। মেজদার দোকানের সামনে, শনি মন্দিরের পাশে পানের দোকানের গায়ে জড়ো হয়ে গেছে সবাই। পাড়ার। বেপাড়ারও।

অনেক চিন্তা করে এই সময়টাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিটা নোটনের। শেষ রাতের ঠিক এই সময়টাতেই গৃহস্থের ঘুম গাঢ় হয়। গুণ্ডা বদমাইশরা পথে থাকে না। পুলিশও বিশ্রাম নেয়। কুকুরের ডাকও শোনা যায় না তেমন। গোটা রামনগরের দেওয়ালে পোস্টার দিয়ে আগুন ধরাতে গেলে এই সময়টার কোন জুড়ি নেই।

একটু সময় নষ্ট করল না কেউ। সাইকেল নিয়ে দুজন দুজন করে ছড়িয়ে গেল। পুবে। পশ্চিমে। উত্তরে। দক্ষিণে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে আঠার বালতি। কেরিয়ারে পোস্টারের তাড়া। বিভিন্ন হাতে লেখা।

দেখতে দেখতে রামনগরের দেওয়াল লাল হয়ে উঠল। আকাশ লাল হওয়ার আগেই। ছেলেরা যে যার মত কাজ সেরে ফিরে গেল।

আবার সব সুনশান। নিস্তব্ধ। একমাত্র রামনগরের দেওয়ালগুলো জেগে উঠেছে। লাল কালিতে লেখা অসংখ্য পোস্টার বুকে নিয়ে গর্জন করছে।

সুতপা বসুর ধর্ষণকারী কাজল, পিঙ্কা, সুঞ্জয়কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

কাজল দত্ত এম এল এ-র বাড়িতে আছে। পুলিশ জানে।

☐ ৬ই মে সকাল সাড়ে দশটা ☐

ঠিক এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বাবলু বা সুতপা কেউই প্রস্তুত ছিল না। প্রিয়ব্রত বা শোভনা তো ননই। অনুতোষ সুরমারাও নন। পাড়ার কেউই নয়।

বাইরে অবিরাম হট্টগোল চলছে। প্রায় আধঘন্টা ধরে। দেওয়াল থেকে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে সমবেত চিৎকার। দ্যাখ না দ্যাখ বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে গেছে জনা পঁচিশেক লোক। সরু রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি। ঠেলাঠেলি। একটা লোকও আর বাড়ির থেকে

বেরোতে পারছে না। সুতপাদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী একজন গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দেয়, পরমুহূর্তে শেষ শব্দগুলোকে নিয়ে ঝংকার তোলে বাকিরা—সুতপা দত্তর ধর্ষণকারী কাজল দত্তর শাস্তি চাই। শাস্তি চাই। শাস্তি চাই।...রমেন দত্তর পোষা কুত্তা কাজল দত্ত কোথায় গেল, রমেন তুমি জবাব দাও।...জবাব চাই। জবাব দাও...মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে রমেন তোমার নোংরা খেলা বন্ধ করো।...বন্ধ করো।...বন্ধ করো।... সুতপা তুমি ভয় পেও না, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

কারা এরা! কোত্থেকে এল!

ভিড়টা যখন প্রথম জমতে শুরু হয় তখনই হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন প্রিয়ব্রত। একজনকেও চিনতে পারেননি। মধ্যবয়সী লোকটি তাঁকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসেছিল,

—কোন চিন্তা নেই দাদা। আমরা এসে গেছি।

একটি ছেলে বলে উঠেছিল—রমেন সিংহর মুখোশ আজই ছিঁড়ে দিচ্ছি আমরা।

আরেকজন বলেছিল—রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলব। থানা ঘেরাও করব। রমেন সিংহর বাড়ি থেকে আজই টেনে বার করব শুয়োরের বাচ্চাটাকে।

প্রিয়ব্রত হতভম্ব। কথাবার্তা শুনে বোঝাই যায় এরা সব বিপক্ষের লোক। কোন দল! বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠি! নাকি বিপরীত পার্টি। অন্য রঙের! মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেন নি। যে হোক, যারই হোক তবু তো এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। নতুন করে বল ফিরে পেয়েছিলেন যেন। জনরোষ প্রবল হলে কতক্ষণ কাজলকে আশ্রয় দিতে পারবেন রমেনবাবু? কিম্বা পুলিশ? ওর মুখে তবে কি আশার আলো ফুটছে! অনুতোষও জ্বর গায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন রাস্তায়। আর সব প্রতিবেশীরা অবশ্য আতঙ্কে ঢুকে গেছেন যে যাঁর খোলসের মধ্যে। জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন শুধু। কে বলতে পারে কখন কি হয়ে যায়!

সকালে প্রথম সেনবাবু বাজার থেকে ফিরে খবরটা দেন প্রিয়ব্রতকে। তখন বোধহয় সাড়ে ছটাও বাজে নি,

—কী কাণ্ড মশাই! গোটা রমেনগর তো একেবারে পোস্টারে

পোস্টারে ছেয়ে গেছে।

—কিসের পোস্টার!

—জানেন না! আপনার মেয়েকে নিয়ে। বলতে বলতে কৌতূহলী হয়েছেন আরও—সত্যি নাকি! কাজলরা রেপ করেছিল তপুকে! মানে বিপিনবাবুর ছেলেটা!

প্রিয়ব্রত বিস্ময়ে হতবাক।

—আরও মারাত্মক পোস্টার পড়েছে। পুলিশের নামে। রমেন সিংহর নামে।

প্রিয়ব্রত পড়িমরি করে ছুটেছিলেন অনুতোষের কাছে,

—এসব কাদের কাজ বলুন তো? কি শুনছি?

অনুতোষও চিন্তিত বেশ—আমিও শুনেছি। আপনার কি মনে হয়? কারা করেছে?

—বুঝতে পারছি না। কি হবে?

—ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ভালই তো হয়েছে।

তবে কি এই লোকগুলোই পোস্টার ছড়িয়েছে! খবর পেল কোথাথেকে! উত্তরোত্তর চিৎকার বেড়েই চলেছে। বাড়ছে। কমছে। থামছে। মাঝে মাঝে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। অনেক তো হল। এবার আরও কিছু করুক। প্রিয়ব্রত ভেতরে এলেন। শোভনা খাবার জায়গায় বসে কুটনো কুটছেন। প্রথমটা প্রিয়ব্রতর মত চমকে উঠেছিলেন তিনিও। এখন মুখ গম্ভীর। কাল থেকেই কথা বলছেন না ভাল করে। থম মেরে আছেন।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেমেয়েরা কোথায়? শোভনার হয়ে উত্তর দিল ঠিকে ঝি—ওই তো ও ঘরে। ঝর্ণাদিদির সঙ্গে কথা বলছে।

প্রিয়ব্রত শোবার ঘরে ঢুকলেন। শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে গেলেন। আবার ভেতরে এলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কখনও ভয়। কখনও যন্ত্রণা। কখনও আশা। কখনও সংশয়। এ এক অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি। পাখার সুইচটাকে নেভালেন। জ্বালালেন। লোডশেডিং চলছে সেই সকাল থেকেই। কখন যে একটু বাতাস পাবেন কে জানে।

বাইরের কোলাহল হঠাৎই যেন থমকেছে একটু। প্রিয়ব্রত

জানলায় এলেন। আরেক ঝাঁক শব্দের ঝাপটা এসে লাগল কানে। শনি মন্দিরের দিক থেকে। আরেক দল আসছে বোধহয়। প্রথমে ফিকে। তারপর ধীরে ধীরে আওয়াজ স্পষ্ট হল। সামনের লোকগুলো সব স্থির তাকিয়ে ডানদিকে। ক্রমে আরও কাছে এল। অনুতোষদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে দ্বিতীয় দল। ভয়ংকর চিৎকার তুলে গর্জে উঠল।

…চক্রান্তকারীদের কালো হাত ভেঙে দাও। গুঁড়িয়ে দাও। …রমেন সিংহের নামে কুৎসা রটিয়ে ফায়দা লোটা যায় না। যাবে না।…

প্রিয়ব্রতর নিশ্বাস আটকে গেল। দ্বিতীয় দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে রমেনবাবুর বাড়ির কালকের সেই লোকটা। জানলা থেকে দ্রুত সরে গেলেন। দৌড়ে ঢুকে গেছেন ভেতরের দিকে,

—তাড়াতাড়ি সব জানলা বন্ধ করে দাও। শীগ্গীরই।

প্রিয়ব্রতর মুখ কাগজের মত সাদা। শোভনা অপ্রতিভ—কি হয়েছে?

—ওরা এসে গেছে!

—কারা?

—রমেনবাবুর লোকেরা। শুনতে পাচ্ছ না? চিৎকার করছে?

কথা না বলে শোভনা আগে ছেলেমেয়ের ঘরে গেলেন। খাটের ওপর তপু, ঝর্ণা, বাবলু তিনজনই কাঠ হয়ে বসে। জানলা তিনটে লাগিয়ে ছিটকিনি তুলে দিলেন ভাল করে,

– কেউ একদম ঘর থেকে বেরোবে না?

ঝর্ণার গলা ছলছল করে উঠল—কি হবে কাকিমা?

—ভয় কিসের? আমরা তো আছি।

দু তরফ থেকেই শ্লোগান ছোঁড়া শুরু হয়েছে এবার। অশ্রাব্য গালিগালাজ চলছে। এই বুঝি মারপিট লেগে যায়। বন্ধ জানলায় কান রেখে কিছুক্ষণ দু পক্ষের কথাই শোনার চেষ্টা করলেন শোভনা। আপনা আপনি মুখ হাঁ হয়ে গেছে,

—ওরাও তো একই কথা বলছে।

—কারা?

—রমেনবাবুর দল ! শোন ভাল করে।

প্রিয়ব্রতর মাথার বিভ্রান্ত ভাব কমল। সত্যি তো। দুদলই আগে পরে শ্লোগান দিচ্ছে…সুতপা তুমি ভয় পেও না, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। দুপক্ষেরই বক্তব্য মিলেমিশে এক। এর মধ্যেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল একটা। ঘোষবাবুদের বাড়ির সামনেই বোধহয় কেউ নামল গাড়ি থেকে। গোলমাল আরও উত্তাল হল।

…দুশমনকে চিনে নিন। এই মাটিতে কবর দিন।…

দুমদুম ঘা পড়ল দরজায়। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

শোভনা প্রিয়ব্রতর হাত খামচে ধরলেন, —খবরদার খুলো না। যা হয় হবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। প্রিয়ব্রতর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

উৎকট আওয়াজ তুলে কড়া নড়েই চলেছে,

—প্রিয়ব্রতবাবু দরজা খুলুন। কোন ভয় নেই। রমেনদা এসেছেন।

শোভনা প্রিয়ব্রত কি করবেন বোঝার আগে আচমকা সুতপা এসে দরজা খুলে দিয়েছে। বাইরের উন্মত্ত আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়েছে গোটা ঘরে। আওয়াজের পেছনে সৌম্যকান্তি রমেন সিংহ। চকিতে একবার সকলকে দেখে নিয়ে নিজেই গিয়ে সোফায় বসে পড়েছেন,

—ছি ছি ছি। একটা মেয়ের মান ইজ্জত নিয়ে কী জঘন্য পলিটিক্স শুরু হয়ে গেছে দেখেছেন ? বলেই চ্যালাদের দিকে তাকিয়েছেন—আঃ। চেঁচামেচি বন্ধ কর। বন্ধ করতে বল। ওরা পাঁকে নামলে তোদেরও নামতে হবে ? আমাদের পার্টির একটা আলাদা ডিসিপ্লিন আছে। দরজাটা বন্ধ করে দে।

কথা মুখ থেকে খসতে না খসতে কাছের মোসাহেব ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। রমেনবাবুর মুখ ঘুরেছে সুতপার দিকে,

—তুমিই সুতপা ?

সুতপার চোখ দপদপ করে উঠল।

—এসো মা। কাছে এসো। কোন ভয় নেই। বিধায়কের মুখে অভয় হাসি।

সুতপা স্থির। দুর্বল শরীরটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। জ্বলন্ত চোখে ক্রমে নেমে আসছে শীতলতা। কঠিন। শান্ত। এ চোখে চোখ রাখা সহজ নয়।

রমেনবাবুও রাখতে পারলেন না। বিব্রত চোখ শোভনার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন.

—আসলে দিদি ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন তো। কাজল বরাবরই ওদের পার্টির ছেলে। গুন্ডা। রাফিয়ান। তা ইলেকশনের আগে হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত। বলে, স্যার আপনার কাছে কাজ করতে চাই। আমি মাস্তানি ফাস্তানি ছেড়ে দিয়েছি। ভাবলাম হয়ত ছেলেটা ভাল হতে চায়। ঠিক আছে করবি কাজ কর। একটা ছেলে ভাল হতে চাইলে তাকে ফেরানো যায় বলুন?

ঘরের সবাই চুপ। রমেনবাবু থামলেন। সকলেই শুনছে তাঁর কথা। শুনছেই শুধু। কোন দাগ কাটছে কি না বুঝতে পারলেন না বিধায়ক। গলা ঝেড়ে নতুন করে কথা শুরু করলেন। হাসি ফোটালেন জোর করে,

—রত্নাকরও বাল্মীকি হয়েছিলেন। ঠিক কি না? তাছাড়া কাজলের বাবা একজন সাচ্চা বিপ্লবী ছিলেন। আদর্শবাদী। তাঁর ছেলেকে শুধরোবার সুযোগ দেব না? ···কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ছিল আমার বিরুদ্ধে প্রিপ্ল্যানড্ কন্সপিরেসি। আমাকে ধ্বংস করার জন্য, আমার ইমেজ নষ্ট করার জন্য ওরা কাজলকে আমাদের পার্টিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি অবশ্য বুঝতে পারার পরই ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। বলেই সঙ্গীদের দিকে তাকালেন,

—বল। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম কি না বল। এপ্রিলের ফার্স্ট উইকে।

কালবের বক্তৃতাবাজ লোকটা গলা মেলাল,

—আসলে কি জানেন তো রমেনদা। কাজল ওদের কাছ থেকে ভাল মালকড়ি খেয়েছে। আসলে আপনি রামনগরের জন্য এত কাজ করছেন, আপনার একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে···

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই রমেন সিংহর মাথার পাশে দাঁড়ানো গাঁট্টাগোট্টা লোকটার গলা গমগম করে উঠল,

—কাজলের কাজের জন্য রমেনদাকে এভাবে··· । ওদের পার্টির

লোকগুলো শালা রামনগরের দেওয়াল নষ্ট করেছে। পোস্টারে মারা! এ নোংরামির বদলা আমরা শালা…

—আঃ রতন! কি হচ্ছেটা কি? রমেনবাবু ধমকে উঠেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক যেমনভাবে ধমকে ওঠে বুলডগের ট্রেনাররা। কুকুর চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলে। কথার অবাধ্য হলে।

শোভনা দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে সংযত করার চেষ্টা করলেন নিজেকে। নাটকের দৃশ্যগুলো দেখে তাঁর বমি আসছে। বিপক্ষ দল এখনও সমানে শ্লোগান দিয়ে চলেছে। বাইরে। একটা মেয়ের আত্মসম্মানকে দাবার ঘুঁটি করে চাল দিয়ে চলেছে দুই রাজনৈতিক দল। মেয়েটা যে একটা মানুষ, তারও যে একটা অস্তিত্ব আছে, সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন আছে এ কথাটা ভুলে গেছে রাজনৈতিক দলগুলো। সুযোগ বুঝে চলেছে এক অলিখিত জমি দখলের লড়াই। রাজনীতির জমি। ছিঃ।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত, বাবলু, সুতপা। সকলকে এক ঝলক দেখে নিয়ে যথাসম্ভব গলাটাকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করলেন শোভনা,

—কিছু যদি মনে না করেন, আপনি এবারে আসুন। ওরাও বাইরে অপেক্ষা করছে।

রমেনবাবু অবাক হয়েছেন খুব—ওরা? কারা?

শোভনার স্বর আরও শান্ত—বাইরে যারা শ্লোগান দিচ্ছে। আপনার বিপক্ষ দল।

—ওরা আবার কি বলবে?

—বাহ্। আপনার নিন্দে করবে না। আপনি যেমন এতক্ষণ ওদের করলেন? প্রতিক্রিয়াশীল-টিল বলবে। আপনার কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইবে। আমাদের তো সব শুনতে হবে। তাই না?

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

শোভনার আর একটা কথাও বলার প্রবৃত্তি হল না।

থানার কিছুটা আগে, জোড়া শিব মন্দিরের চত্বরে বসেছিলেন ওঁরা। অনুতোষ, প্রিয়ব্রত, শোভনা, সুরমা। চাপা উত্তেজনায় চারজনই হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প। অনুতোষের মাথায় বড় ব্যাণ্ডেজ। কালও ফাটা জায়গাটা দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

মেঘহীন আকাশ থেকে শেষ বৈশাখের ঝাঁঝালো রোদ নেমে এসে ছড়িয়ে পড়েছে দশদিকে। মন্দির চত্বর আগুন হয়ে উঠছে ক্রমশ। গরম বাতাসের হল্কা মাঝেমাঝেই এসে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে শরীরে।

শোভনা একবার উঠে রাস্তাটা দেখে এলেন—আর কেউ মনে হয় আসবে না।

সুরমা ম্লান হাসলেন—কত রকম কাজ আছে সবারই। অফিস! কাছারি! ঘর! সংসার!

অনুতোষের গলায় ঝাঁঝ ফুটল—কারুর আসার দরকার নেই। আমরাই যথেষ্ট। তেমন হলে আমরা চারজনই···

প্রিয়ব্রত শ্বাস ফেললেন, —কিছু হবে বলে কি মনে হয়?

—আলবৎ হবে। সমস্ত নিউজপেপারে খবর হয়ে গেছে। চাপা দেওয়ার রাস্তা কোথায়?

—আপনি তো সেদিন ডি এম-এর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তো সব জানেন। পিঙ্কা, সুজয়কে ধরা গেল, আর কাজলকে ধরা গেল না?

—কাজলকেও লুকিয়ে রাখা সহজ হবে না আর। বাবারও বাবা আছে। আজ এখানে কাজ না হলে আই জি-র কাছে যাব। রাইটার্স আছে। মিনিস্টাররা আছেন।

প্রিয়ব্রত হাত ওল্টালেন—পিঙ্কা, সুজয়কে ধরা তো সোজা। কোন রাজনীতির খুঁটি নেই ওদের। পুলিশেরও ওদের ধরতে তাই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু কাজল...প্রিয়ব্রত নিজের মনেই বলে চললেন, —আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। এস পি কোন স্টেপ নিল না। ...রামনগরের হাওয়া কেমন গুমোট হয়ে গেছে···দুতরফেই মনে হয় আস্তিনের নিচে ছুরিতে শান দিচ্ছে···। আপনি

কি বলতে চান মিনিস্টাররা কেউ কিছুই জানেন না ?

অনুতোষ এবার আর উত্তর করলেন না। হয়ত প্রিয়ব্রতই ঠিক ; কিন্তু সাপের লেজে পা যখন পড়েছেই, সাপটার মোকাবিলা করতেই হবে। এত দূর এগোনোর পর এছাড়া বাঁচার পথ কোথায় ? বাঁচলেও সে বাঁচার মূল্য কি ?

শোভনা বললেন—আমার তো বেশি চিন্তা হচ্ছে ছেলেগুলোকে নিয়ে। আজ নয় কাল সবাই জানবে পোস্টারগুলো মেরেছিল কারা। তখন আবার নতুন করে না বিপদ আসে···

সুরমা বললেন—এরকম বিপদ যেন কারুরই না আসে সেজন্যই তো সবাইকে ডাকা। তপু কি শুধু আপনারই মেয়ে ? প্রত্যেক বাড়িতে তপু নেই ? বাবলু নেই ? নোটন নেই ? ভানু নেই ? ভগবান না করুন কাল অন্য কোন তপু যদি···

সুরমা কথা শেষ করলেন না। পরশু সন্ধে থেকে প্রতিটি দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। সুভাষ পল্লীর। চৌধুরী বাগানের। পুরনো বাজারের। নতুন বাজারের···। নিজের পাড়ারই কেউ সাড়া দিল না তেমনভাবে। ব্যানার্জি গিন্নী বললেন, সত্যিই যাওয়া উচিত। কিন্তু উনি কি পারবেন ! ওনার অফিসে এখন যা ঝামেলা যাচ্ছে। তবু বলব। আর আমি তো হেঁসেল ঠেলে ···দেখি··· পারলে নিশ্চয়ই যাব। ব্যানার্জিবাবুর ছেলের বউটা সেই যে পর্দার কোণ থেকে উঁকি মেরে পালাল আর বেরোলই না সুরমা থাকা পর্যন্ত···ঘোষবাবু সোজাসুজি বলে দিলেন, এসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাঁটা ভাল না। যথেষ্ট তো হল। মিছিমিছি প্রিয়বাবুর মেয়ের বদনাম বাড়ছে··· মণ্ডলগিন্নী মুখের ওপর বলে দিলেন, আমি তো আগেও বলেছি, সোমথ মেয়ের অত রাত অবধি বাইরে থাকা ঠিক না। কার দোষ বেশি কার দোষ কম কে জানে···আর ওপর মীরাবৌদি তো সুরমাকে দেখে কেঁদেই সারা, আমার বাড়ির থেকে ফেরার পথে এমন ঘটনাটা ঘটল ! আমি এখনও ভাবতে পারি না। রোজ ভাবি সুতপাকে দেখতে যাব। কিন্তু কি বলব ওকে গিয়ে ভাবতেই বুকটা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। থানায় যেতে বলছেন, সবাই গেলে নিশ্চয়ই যাব। তবে ওকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে

হবে···বুলা বলে বৌটাতো কথাই বলল না ভাল করে···অন্য পাড়ার মেয়ে-বউরা রসিয়ে রসিয়ে জিজ্ঞেস করে সব। আসল কথা হ্যাঁ হুঁ করে এড়িয়ে যেতে চায়। ···কয়েকজন অবশ্য কথা দিয়েছেন আসবেন! ···কজন যে শেষ পর্যন্ত আসবে!

সুরমা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন, ঠিক তখনই অনুতোষ চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মন্থর পায়ে, লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কুঁজো শরীরটাকে এদিকেই টেনে আনছেন বিপিনবাবু। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন শোভনা। প্রিয়ব্রত। সুরমা। বিপিনবাবু তাঁদেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন। লাঠিতে ভর দিয়ে প্রাণপনে সোজা থাকার চেষ্টা করছেন,

—এলাম। তোমরা থানায় যাবে না? কটায় যাওয়ার কথা?

প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে বিস্ময় ছিটকে এল—আপনি!

—হ্যাঁ আমি। কত দিন কোন ভাল কাজ করিনি। মরবার আগে অন্তত একটা ভাল কাজও যদি···

চারজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কথা হারিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ এক মনে বলে চলেছেন—লোভ। লোভ বড় মারাত্মক জিনিস। ছোঁয়াচে। ছেলেটার মা লোভে পড়ে গেল। বোনেরা লোভে পড়ে গেল। আমিও কি লোভে পড়ে গিয়েছিলাম? নইলে আমিও এতদিন চুপ করে ছিলাম কেন? আমার অন্যায় কি কম অনুতোষ?

অনুতোষ বিপিনবাবুর হাত ধরে ফেললেন—এ আপনি কি বলছেন? আপনি বৃদ্ধ মানুষ···

—বৃদ্ধ। অন্ধ তো নই। বিপিনবাবুর গলা কান্নায় বুজে গেল,

—তোমরা আমাকে একবারও ডাকলে না অনুতোষ?

—আসলে···মানে আপনারই ছেলে তো। অনুতোষের গলায় দ্বিধা,

—এরকম ক্রিমিনাল কারুর ছেলে হয় না। ভাই হয় না। স্বামী হয় না। চলো। তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

শিব মন্দির থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন পাঁচজন। পাঁচ

জোড়া পা, একটা লাঠি। থানার দিকে এগোচ্ছেন। কাছাকাছি এসে প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়ালেন। থানার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো রিক্সাঅলাটা,

—এত দেরি করলেন কেন বাবু? আমি কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রিয়ব্রত অবাক—তুমি কি করে খবর পেলে?

—রামনগরের সব ঘরেই তো জানে। বাতাসে খবর উড়ছে। আজ সকালে আমার রিক্সায় বসে দুই বাবু তো এই নিয়েই কথা বলছিল। তাদেরও নাকি আসার কথা। কিন্তু আসতে পারবে না। হাঃ। সব ভয়ে কাঁপছে।

—তোমার ভয় নেই?

—কিসের ভয়? জানটার? একটা পা তো চিতায় দিয়েই আছি। বড় জোর আরেকটা পা ঢুকে যাবে। আর জানেনই তো বাবু আমাদের মানটানের বালাই নেই। ওসব আপনাদের জন্য। যারা এসব নোংরা কাজ করে। আর সামলায়।

প্রিয়ব্রত লোকটার পিঠে হাত রাখলেন—এসো।

□ ৮ই মে বেলা একটা □

—আপনারা এত অবুঝ হচ্ছেন কেন? ডি এম একটু পরেই আসছেন, আমিও ও সি-র ফোন পেয়েই চলে এসেছি। আপনাদের সঙ্গেই দেখা করব বলে। এস্ পি-র গলায় মিনতি ঝরে পড়ল, —কাল দুজন কালপ্রিট তো ধরা পড়েছে। কাজল দত্তর নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে…

—ওয়ারেন্টের গল্প আর আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই। অনুতোষ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—যেখানে এম এল এ-র বাড়িতে কালপ্রিট লুকিয়ে থাকে, সেখানে ওয়ারেন্ট দিয়ে কি হবে মশাই?

—এটা কিন্তু আপনারা ঠিক বলছেন না। রমেনবাবুই তো নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই ছেলে দুটোকে অ্যারেস্ট করিয়েছেন। আপনারা একটু বেশি…সি এম কালকেই নিউজপেপার দেখে আই-জি

আর ডি এম-কে অর্ডার করেছেন···ধরার চেষ্টা তো হচ্ছেই। হি ইজ অ্যাবস্কন্ডিং।

এস পি ওসির চেয়ারে বসে আছেন। ও সি পাশের চেয়ারে। দরজার কাছে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে মেজ দারোগা। সেদিনের সেই ডিউটি অফিসার। দরজার বাইরেই তিনজন কনস্টেবল। গোটা থানা জুড়ে একটা টানটান ভাব। পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে।

ও সি খুব বিনীত মুখে তাকালেন প্রিয়ব্রতর দিকে,

—অল পসিব্‌ল্‌ প্লেসে সার্চ করা হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি···

—কথা তো আপনি আগেও দিয়েছিলেন। অনুতোষের গলায় বিদ্রূপ।

এস পি এবার একটু আড়াল করার চেষ্টা করলেন নিজের বাহিনীকে—এঁদেরকেও তো নানান প্রেসারে কাজ করতে হয়। চাকরির ভয় আছে। বদলির ভয় আছে। আপনারা তো সবই বোঝেন···দেখছেনও তো কয়েক দিন ধরে···আমাদের অবস্থাটাও একটু ভাবুন।

—সেজন্যই তো ভয়। বিপিনবাবু এই প্রথম কথা বললেন—যেখানে রক্ষকরাই নিজেদের ঠিক মত রক্ষা করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে থাকে, সেখানে এঁদের নিরাপত্তার যে কি অবস্থা হবে!

ও সি-র এতক্ষণে নজর পড়েছে পেছন দিকে চেয়ারে গুটি সুটি হয়ে বসে থাকা বিপিনবাবুর দিকে। ভীষণরকম চমকে উঠেছেন, কাজলকেও এই মুহূর্তে থানায় দেখলে এতটা অবাক হতেন না যেন।

ও সি-র চমকে ওঠা এস পি-র নজর এড়াল না।

—কে ইনি?

ও সি কিছু বলবার আগে, বিপিনবাবুই বলে উঠেছেন,

—আমি বিপিন বিহারী দত্ত। সেই কালপ্রিট কাজল দত্তর বাবা।

জগিং করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। পুরনো পল্লীর ফুটবল মাঠের দিকে। দৌড়চ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মাথা তুলে। আবার দৌড়ল। হাঁটু তুলে বুকে ঠেকাল একজন। অন্যজন দুহাত ছড়িয়ে দিল। আরও দম বাড়ানো দরকার। আরও। হা হা শব্দ করে আবার ফুসফুসে অক্সিজেন ভরে নিল। দাঁড়িয়ে পড়ে এক সঙ্গে ঘাড় দোলালো দুজনে। ঘাড়ের পেছনে হাত। শরীরটাকে আরও তাজা করতে হবে। সামনে।

ভোরের পৃথিবী উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে ক্রমশ। আকাশ ঝকঝকে। প্রথম সকালের গন্ধ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। মাঠের পূর্বদিকে ছোট্ট জলাভূমি। তার ওপারে রবার কারখানার উঁচু পাঁচিল। কিছু ঝোপঝাড়। আগাছা।

ছেলে দুটো মাঠের এ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল,

—দেখেছিস?

—হ্যাঁ। কে একজন পড়ে আছে মনে হচ্ছে!

পায়ে পায়ে এগোল দুজনে। সামনে গিয়ে শিউরে উঠেছে। জলা আর আগাছার মাঝামাঝি জায়গায় একটা লাশ। পরনে ব্লু জিনস্। গোলাপি টি শার্ট। এক মাথা এলোমেলো চুল। দামি রিস্টওয়াচ বাঁধা হাতে। মুখটা উল্টোদিকে ফেরানো।

ছেলে দুটো পরস্পরের হাত চেপে ধরে আরেকটু এগোল। বিস্ফারিত চোখে ঝুঁকেছে। কপালে পরপর দুটো গোল গর্ত। বুলেটের। সেখান থেকে কালো জমাট রক্ত নাক বেয়ে গড়িয়ে গেছে গালে। কাঠ পিঁপড়েরা সারি দিয়ে উঠছে বুক থেকে কপালে।

—চিনতে পারছিস? একজন ফিসফিস করে উঠল।

—কাজল দত্ত। অন্যজনের গলা ঘড়ঘড় করে উঠেছে।

—চল, কেটে পড়ি!

ওরা সরে যাওয়ার আগেই আরও দু-তিনজন লোক এগিয়ে এসেছে। তাদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন। একটু একটু করে ভিড় জমে গেল।

—ইসস্। মেরেই দিল!

—কার কাজ বলুন তো ?

—কার আবার ? বোঝাই তো যায়…

—হ্যাঁ, ওই রমেন সিংহ….

—পুলিশও হতে পারে।

—বেশি আলোচনা না করাই ভাল।

—যা বলেছেন।

—কাজলকে যাদের দরকার ছিল, তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

হ্যাঁ। কাজলের দিন শেষ। এবার হয়ত রতনের দিন শুরু। কিম্বা অন্য কোন কাজলের।

ভিড় পাতলা হচ্ছে আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত রামনগরের মানুষেরা আবার থিতিয়ে এল। যে যার নিজের কাজে ফিরছে। উদাসীন। নিরুত্তাপ। নিস্পৃহ।

রামনগর প্রাইমারি স্কুল থেকে কোরাসে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে তখন। শিশু কণ্ঠের গান ভাসতে ভাসতে দিক্-দিগন্তে ছড়িয়ে গেল। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

এ কী করে বসলে হে অপূর্বকান্তি মুখার্জি ! তুমি তো শালা এমন ভাবের চরকিতে লাট খাওয়ার বান্দা নও ! আজ কী হয়ে গেল ! শ্রবণাকে দেখতে পেয়ে ভেঙে একেবারে চুরমার ! পর পর সাজানো শিডিউল সব ঝেড়েমুছে এ কোথায় চলেছ ? যাচ্ছ তো না, ফিরছ । হ্যাঁ হে ফেরা একেই বলে । দাঁড়াও । বোকামি কোরো না । লাঞ্চের পর অফিসে ফিরেই একটা ক্লোজড্ ডোর মিটিং-এ বসার কথা । ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, চীফ্ ইন্‌জিনিয়ার আর সিকিউরিটি অফিসারদের সঙ্গে । অ্যান্ড দ্যাট মিটিং ইজ ভেরি ভেরি ভেরি আরজেন্ট । টপ কনফিডেনশিয়াল । ম্যানেজমেন্ট লক আউটের ডিসিশন নিয়ে ফেলেছে । সম্ভবত সেকেন্ড জুলাই থেকে তালা ঝুলছে কারখানায় । এ সময় কর্তৃপক্ষের বাহুবল বলো বাহুবল, মনোবল বলো মনোবল, সবই তো তোমরাই হে । মেইন স্টিয়ারিং ফোর্স ।

সব না হলেও, এবারকার লক আউটের উদ্দেশ্য মোটামুটি তোমার অজানা নয় । ফরিদাবাদ প্রডাকশন শুরু করে দিয়েছে । এখন থেকে এক্সপোর্ট মেটিরিয়াল সব ওখানেই তৈরি হবে । তোমাদের এখানে শালা কিস্যু হবে না । থ্রু আউট দি ইয়ার শুধু লেবার প্রবলেম, শ্লোগান, ডিমান্ড, ডেপুটেশন, ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান । পারলে তোমার কোম্পানি এ দেশটা থেকেই ব্যবসা গুটিয়ে নিত । তবু কেন যে নেয় না ! রহস্য । রহস্য । তোমার অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই । জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর তিনটে মাস প্রোডাকশন বন্ধ ইজ কাফি । ম্যানেজমেন্টের পারপাস সার্ভ করে যাবে । তিন মাস শালা লেবারগুলো খেতে পেল কি না তা নিয়ে তুমি ভাবার কে ? ভুগুক যে যার নিজের কপাল নিয়ে । গরিব দেশের জনগণকে ওভারডোজ পলিটিক্স গেলালে তাদের এই দশাই হয় । বাবাসকল, এক রকম ট্রেড ইউনিয়নে না মজে নিজেদের সংগঠিত করো আগে । তোমাদের সাধের নষ্টাম্‌গুলো কত শক্তিশালী পরখ করে রাখো । নইলে যে এইটিন ফরটি এইটের··· । এঙ্গেলস, কোট করতে গিয়ে, কে যেন বলত কথাটা ? সুকান্ত ? হিমানীশদা ? ছাড়ো । ওসব ভাবনা কবেই বেওয়ারিশ হয়ে গেছে । পরিস্থিতি এখন অন্যরকম । তাবড় তাবড় নেতারাই

যেখানে সব ব্যোমভোলা মেরে বসে আছেন সেখানে তুমি কোন হরিদাস…! মাৎস্যন্যায় বুঝলে মাৎস্যন্যায়। মিছিমিছি সুস্থ ব্রেনকে ট্যাক্স করতে যেও না। দিব্যি মস্তিতে আছ। মাস গেলে পার্কস-ফার্কস নিয়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার। ক্যারি অন্। ইট্, ড্রিংক অ্যান্ড বি মেরী। জীবন ভাই একটাই। সুযোগ পেয়েছ, চোখটি বুজে ভোগ করে যাও। তোমার মত আপার-টায়ারদের ছুটছাট লক আউট কোনদিনই তেমন কামড় দিতে পারে না। স্লাইট দুশ্চিন্তা ছাড়া। তোমরা হলে গিয়ে সব মস্তমানুষ।

গাড়ি চালাতে চালাতে তবু বারবার আড়চোখে শ্রবণার দিকে দেখছ কেন? স্টিয়ারিং-এর ওপর তোমার সুচারু আঙুলগুলো টিপটিপ কাঁপছে। শ্রবণা এখনও তোমার সঙ্গে নিজে থেকে একটাও কথা বলেনি। উদাস তাকিয়ে আছে বাইরে, রোদপোড়া রাস্তার দিকে। চশমা পরে শ্রবণাকে কেমন অন্যরকম লাগছে। যেন শ্রবণা নয়, অনেক দূরের কেউ। চেহারাও ভেঙেছে প্রচুর। আগের সেই ঢলঢলে ভাবটাই নেই। বর্ণহীন, ফ্যাকাসে শরীর। কণ্ঠার হাড় ঠিকরে পড়ছে। চুল কমে কপাল চওড়া। তবু শ্রবণা শ্রবণাই। নিজস্ব ব্যক্তিত্বে, ভঙ্গিতে, জেদে। তুমি ভেতরে ভেতরে ভাঙতে শুরু করেছ। আঃ অর্ণব, ডোন্ট বি ক্রেজি। এখন আর কোন ভাবাবেগ তোমাকে মানায় না। এখনও সময় আছে। তোমারি লাল টুকটুক মারুতি সবে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ক্রস্ করল! এখনও ফিরলে মিটিংটা……। মনে রেখো ওই মিটিংটার পর একগাদা পেপার্স রেডি করতে হবে। নোটিশ ফর দা ওয়ার্কারস্। তারপর ইউনিয়ন লিডারদের সঙ্গে আলোচনায় বসা।

হ্যাঁ। ঠিক চারটে পনেরোয় তুমি সময় দিয়েছ ইউনিয়ন লিডারদের। সময়টা যদিও তোমার দেওয়া, বক্তব্যগুলো তোমার নয়। ওপরতলার নির্দেশাবলী পেয়ে গেছ যথাসময়ে। সেগুলোই একটা একটা করে সার্ভ করতে হবে এদের কোর্টে। নিখুঁতভাবে, শান্ত মাথায়। অ্যাট্ এনি কস্ট লোকগুলোকে উত্তেজিত করা দরকার। তবে সাবধান। যত বোকা ভাবো, ওরা সবাই কিন্তু ততটা নয়। দু-চারটে জোরালো 'এস্' ওরাও মারতে জানে। অবশ্য তুমি দক্ষ খেলোয়াড়। সার্ভিস রিটার্নের ব্যাপারে তোমার

কোন বিকল্প নেই। এভবার্গ ইণ্ডিয়ার তাবৎ আধিকারিকবৃন্দ তোমার কর্মকুশলতায় মুগ্ধ, গর্বিত। কেউ কেউ আড়ালে ঈর্ষান্বিতও বটে। যেমন সান্যাল, ডানেজা, কুরুভিলা। তুমি কেয়ার করো না। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কে তুমি ছোট থেকেই ওস্তাদ। ভালোই বোঝো কিভাবে কাটাকুটি প্লাস মাইনাস করে সঠিক উত্তরে পৌঁছতে হয়। এবারকার রিট্রেঞ্চমেন্ট পলিসিটাকে যদি খেলিয়ে তুলতে পারো তো ব্যস্। এভবার্গ ইণ্ডিয়ার লক্ষ্য না হও, ইনস্যাট্ ওয়ান বি হওয়ার জায়গাটা তোমার বাঁধা। এমন একটা ব্রাহ্ম মুহূর্তে গায়ে পড়ে শ্রবণাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাওয়া নিছকই মূর্খামি হয়ে গেল না?

একটু আগেও কানা শৃগালের ঝিরিঝিরি আলোতে বসে যখন চুমুক দিচ্ছিলে চিল্ড বিয়ারে, তখনও কি ভেবেছিলে একটু পরেই দেখতে পাবে শ্রবণাকে? সতেরো বছর পর? লাখোটিয়া আজ একরকম জোর করেই তোমাকে নিয়ে এসেছিল লাঞ্চে। অফিস থেকে বেরোনোর আদৌ ইচ্ছে ছিল না তোমার। থাকবে কী করে? বাপ্, কদিন ধরে কলকাতায় যা দুরন্ত গরম! দুপুরবেলা সূর্য যেন কামান দাগে রাস্তায়। গাড়ি টাড়ি ফারনেস্ হয়ে যায়। এই গরমে কোন ভদ্রলোকের রাস্তায় বেরোনো উচিত নয়। কথাটা তোমার নয়। তোমার বউয়ের। বেচারি মোটেই গরম সহ্য করতে পারে না। আজকেই পার্ক স্ট্রীটে আসতে আসতে ভাবছিলে গাড়িটা এয়ার কণ্ডিশন্ড করে নেওয়া যায় কিনা। শুনেই লাখোটিয়ার কী লম্ফঝম্ফ। পারলে বেটা তখখুনি একখানা এয়ারকুলার এনে বসিয়ে দেয় তোমার চলন্ত গাড়িতেই। লোকটা কতভাবেই তোমাকে ওবলাইজ করার চেষ্টা করে। কথার ঝরনায় মেজাজটাই খোলতাই করে দিল তোমার।

তারপর গাড়ি লক্ করে বার-কাম-রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই উফ্ কী আরাম। জুনের প্রচণ্ড দাপটে যখন গোটা শহরটা পুড়ছে ধিক ধিক, পিচ গলছে রাস্তায়, হলদেটে মাঠগুলো ধুঁকছে মুমূর্ষু রুগির মত, প্রাণিজগত জুড়ে অসহায় আর্তনাদ, তখন হিমালয় তোমাদের জন্য এরকম পাহাড়ী শীতলতা পাঠিয়ে দেয় কোথাও কোথাও। শুধু তোমাদের জন্যেই। তুমি সেই বরফগলা, আবছায়ায় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিলে একটি মনোরম লাঞ্চ। ইদানিং আবার

ওখানে এক সোনালি চুল গায়িকা আমদানি করা হয়েছে। আহা, কী তার বিভঙ্গ কী লাস্য! মাউথপিসটা ঠোঁটের কাছে ধরে দোলে মৃদু মৃদু। দোলে না, যেন জোয়ার আনে শরীরে। দীর্ঘ শরীর বেয়ে ঢেউ কুলকুল। কাস্টমাররা সব পানাহার ভুলে যায়। চার ধারে দারুণ স্মার্ট পোশাকের গোটা পাঁচেক মিউজিক হ্যান্ড্ নিয়ে মেয়েটা আজ হাস্কি সুরে ভাসাচ্ছিল, —আই ডোন্ট্ নো হাউ ফাআর হ্যান্ড্ আই টু গো···হো···ও···ও।

লাখোটিয়া খলবল করে উঠেছিল, —ওয়াও। শি ইজ আ রিয়েল হার্টথ্রব। সালুজা কোথ্থেকে এই গোল্ডেন পিস্টা কালেক্ট করল বলুন তো ? সিম্পলি এনচানটিং।

মেয়েটা নয়, মেয়েটার গান শুনে কেন যে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলে বারবার! তবে কি শ্রবণার সঙ্গে দেখা হওয়ার ইঙ্গিত আসতে শুরু করেছিল তখন থেকেই! কে জানে! প্যারাসাইকোলজিতে হয়ত ব্যাখ্যা মিলতে পারে। লাখোটিয়া যখন মেয়েটাকে চাখতে চাখতে বিজ্নেস টক সারছে, চুমুক দিচ্ছে ব্ল্যাক লেভেলে, দাঁতে সিজলার ছিঁড়ছে, তোমাকে তখন দুম করে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ভর করে বসলেন আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে···। রাবিশ। কোথায় জম্পেশ করে মেয়েটার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স মাপবে, তা না, বুদ্ধুর মত বিয়ারে চোখ ফেলে আবৃত্তি করে চলেছ—

—কি আছে হোথায় ?

চলেছি কিসের অন্বেষণে ?

লাখোটিয়া ভুরু কুঁচকেছিল। স্ট্রেঞ্জ! দু গ্লাস ঠাণ্ডা বিয়ারেই মুখার্জি সাহেব আজ আউট। যে কিনা হাঁসের মত মাল টানতে পারে! তোমার পরিচিত মহলে প্রবাদ চালু আছে—এক পেগে মুখার্জি রঙিন হয়, দু পেগেতে ধ্যানী, তিন পেগে পদ্য ধরে, চারেতে জ্ঞানী। এরপর পাঁচ ছয়ে উঠলে তো কথাই নেই। তখন অর্ণব মুখার্জি একজন সাচ্চা বিপ্লবী। একেবারে কট্টর মার্কসিস্ট্ লেনিনিস্ট্। সেই মক্কেলকে যদি ব্ল্যাকলেভেলেই কবিতা ধরায়···

অবশেষে স্বর্গ হতে বিদায়। দুটো দশ নাগাদ কাচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলে তোমরা। আশ্চর্য! একটা মাত্র মোটা কাচের দুধারে দুটো সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী। সিঁড়িতে পা

রাখতেই এক ঝলক রাগী বাতাস নেড়ি কুত্তার মত লাফ দিয়ে পড়ল গায়ে। গরম হল্কায় চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ। তাড়াতাড়ি রুমালে নাক চাপলে। সানগ্লাস চড়ালে চোখে। তারপর যখন গাড়ির দিকে এগোচ্ছ, তখনই দৃশ্যটা সুখী সৌভাগ্যবান অর্ণব মুখার্জিকে একেবারে খান্ খান্ করে দিয়ে গেল। ফুটপাতের কৃপণ ছায়াটুকু ধরে কী ভীষণ ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে শ্রবণা। চৌরঙ্গির দিকে।

শ্রবণাই তো? তুমি পাথর। নাহ্, এতদিন পরও শ্রবণাকে চিনতে তোমার ভুল হয়নি। বাঁ পাটাকে সামান্য টেনে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে মেয়েটা। মেয়েটা? নাকি মহিলা? সতেরো বছরের অদেখা স্বাভাবিক ভাবেই তোমার কাছে শ্রবণাকে সেই কুড়ি বছরের মেয়েটিই রেখে দিয়েছে। তুমি কেঁপে উঠলে। যেমন ভাবে হঠাৎ ঝড়ে সমূলে নাড়া খায় নিশ্চিন্ত গাছ কিম্বা চকিত ভূকম্পে দুলে ওঠে কংক্রিট্ ভিত, তেমনি তোমার গোটা অস্তিত্বটাই টলমল করে উঠল।

শ্রবণা তোমাকে দেখতে পায়নি। মাথা নিচু করে আনমনে হাঁটছে। তুমি হ্যাংলার মত ছুটে গেলে। শ্রবণা তখন ম্যাগাজিনের স্টলটা সবে ছাড়িয়েছে।

—শ্রবণা···

শ্রবণা চমকে তাকাল। তোমাকে দেখে চকিতে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠল দুচোখে। জ্বলেই নিভে গেল। তুমি বোকার মত বলে উঠছ—আমাকে চিনতে পারছ না? আমি অর্ণব।

আলগা হেসে মাথা দোলাল শ্রবণা। কয়েক পলক চোখ বুজে থাকল। তুমি দেখতেও পেলে না সেই ফাঁকে কী বিরাট একটা শ্বাস বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলল মেয়েটা।

তুমি আরেকটু এগোলে। শ্রবণা কত পাল্টে গেছে। যাবেই তো। সতেরো বছর বড়ো লম্বা সময়। তবে সময়ের পলি পড়ে কেউ ধু ধু চরা হয়ে যায়, কেউ সময়ের স্রোত ধরে শুধু ছোটে।

তুমিই কি কম বদলেছ হে? তোমার গায়ে এখন বম্বে ডায়িং-এর সব থেকে দামী এইট্টি টোয়েন্টি, কানাডা থেকে আনা ফেডেড্ জিনস্, শরীর জুড়ে ফ্রেঞ্চ কোলনের সুবাস। সেজেগুজে থাকলে তোমাকে যা দেখায় না! মাইরি। দেহের কিছু বাড়তি অ্যাল-

কোহলিক মেদ বাদ দিলে হুবহু অ্যাডমডেল। পারফেক্ট সেক্স সিম্বল। তোমার পাশে তাঁত শাড়ি পরা, কাঁধে ঝোলাব্যাগ, শুকনো চেহারার দিদিমণিটি এখন একেবারে বেমানান।

তুমি এক নিশ্বাসে বলে ফেললে, তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখা হবে ভাবতেও পারিনি। কেমন আছ?

শ্রবণা আলতো হাসল, ভাল। তুমি?

না হে অর্ণব, শ্রবণার চোখ দুটো এখনও তেমনই আছে। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত। বরং মোটা দুটো লেন্সের ভেতর দিয়ে তারা আরও ভাস্বর। কোন কোনদিন বিরল মুহূর্তে তুমি কাব্য করে উঠতে—

…কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে…

শ্রবণা জীবনানন্দ ভালোবাসত খুব। তবু চোখ পাকাত। তুমি হো হো হেসে উঠতে, দাঁড়াও দাঁড়াও। এখনও কিন্তু শেষ করিনি, সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে…'

লাখোটিয়া আজ হেভি ভিরমি খেয়েছে। হায়! দুনিয়ায় কত বিস্ময়ই না আছে। শেষে মুখার্জি সাহেব কিনা…। রিয়েলি। টোটাল অর্ণব মুখার্জি কেমন যেন ভেবলে গেছে। মায়া হচ্ছে তোমাকে দেখে। কী ভীষণ ঘেমে উঠেছ। চলন্ত গাড়ির গায়ে ছিটকে আসা হাওয়ারাও তোমাকে শুকিয়ে দিতে পারছে না। হোয়াট অ্যা পিটি! কথা বলতে গিয়ে স্মার্ট মুখার্জির জিভ ধরে যাচ্ছে,।

—কি করছ তুমি এখন?

শ্রবণা তাকিয়েই আছে চলমান জনপদের দিকে,—চাকরি, স্কুলে।

—কোথায়?

—এই যাদবপুরেই।

কী সংক্ষেপে ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছে শ্রবণা। বুঝি স্থির করে ফেলেছে একটাও বাড়তি কথা বলবে না। দুপুরের রাস্তাঘাট এখন কিছু ফাঁকা ফাঁকা। গ্রীষ্মরোদে পুড়তে পুড়তে গাড়ি-ঘোড়াগুলো

দৌড়চ্ছে গোমড়ামুখে। অবসন্ন মানুষেরা পথ চলছে।

ট্রাফিক সিগনালে থেমে তুমি সিগারেট ধরিয়েছ,—যাদবপুরে কতদিন আছ?

শ্রবণার ভাঙা গাল বেয়ে গড়িয়ে গেল দীর্ঘ ক্লান্তি, 'অনেকদিন। বছর চোদ্দ।

তুমি ঝটপট ভাবতে শুরু করেছ। চোদ্দ বছর কী করে হয়? বন্দীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল সাতাত্তরে। যতদূর জানো।

—আমাকে ছেড়েছে চুয়াত্তরের শেষে। স্পেশাল কনসিডারেশনে। শ্রবণা কোলের কাছে ব্যাগটাকে ঘন করে টেনে নিল,—আমার ছেলের জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চেপেছ। তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত যান্ত্রিক শব্দটা থেমেও অনেকক্ষণ রেখে দিল। চমকে ফিরেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে শ্রবণা। খররোদে চোখ রেখে স্পষ্ট উচ্চারণ করছে,—বাহাত্তরে হয়েছে। ডিসেম্বরে। জন্ম থেকেই ক্রিপল্‌ড্। কোন পায়েই জোর নেই। নার্ভের গণ্ডগোল।

বাহারে বা অর্ণব মুখার্জি, এই তবে মানবমন। তুমি পাগলের মত হিসাব মেলাতে শুরু করে দিয়েছ।···তোমার সঙ্গে শ্রবণার শেষ দেখা কবে যেন? হ্যাঁ, একাত্তরের অগাস্ট্। বরানগর কাশীপুরে ম্যাসাকারের দিন দশেক পরে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব-টিপ্লব তখন মাথায় উঠেছে তোমাদের। তাড়া খাওয়া কুত্তার মত শুধু ছুটে মরছ। চারদিকে কেবল খুন জখম আর পুলিশের বাধাহীন অত্যাচার। বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার, কোন্নগর সব কিছুকে সদ্য হারিয়ে গেছে বরানগর, কাশীপুর। পলিটিক্যাল রিভেঞ্জের চেহারা বীভৎস পর্যায়ে। শুধুই এখানে ওখানে খুনজখম নয়, পাইকারি হারে গোপনে লাশ পাচার করাও নয়, ঘরে পাড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় টেনে বার করে মেরে ফেলছে। কুঠিঘাট রোডের ওপর মঞ্চ তৈরি করে নিহতদের তালিকাও নাকি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার তাণ্ডবে দেড়শ জনেরও বেশি টাটকা যুবক শেষ। শিশু আর বয়স্করা পর্যন্ত বাদ যায়নি। সুকান্ত, মিহির, অরিন্দম কেউ নেই। হিমানীশদা আগেই ধরা পড়েছেন। বেঁচে আছেন কিনা কেউ জানে না। পল্লবীও জেলে। হারাধনের দুটি ছেলের মত তোমরা দুজন

শুধু টিমটিম জ্বলছ। ভাগ্যিস অগাস্টের প্রথম দিকেই তুমি আর শ্রবণা শেলটার নিয়েছিলে চম্পাহাটিতে। শ্রবণার মাসির বাড়ি। তারপর কবে যেন উদ্ধার হলে তুমি ? সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। ওই মাস দেড়েক সময়টা যে কী ভীষণ হতাশার। তবে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার মুহূর্তেও বোধহয় এক ধরনের টান তৈরি হয়। টান, না প্যাশন ? প্যাশন না মোহ ? জাহাজ থেকে ছিটকে পড়া দুটো নাবিকের তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তের মত অথবা মৃত্যুভয়ে পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নেওয়া দুটো জন্তুর মত তোমরা তখন আঁকড়ে ধরতে চাইছ পরস্পরকে। আরও গভীরভাবে। তখনই অনেক ছেলেমানুষির মত আরেকটা ছেলেমানুষি…রেডবুক ছুঁয়ে কোন্ তারিখে যেন বিয়ে করেছিলে তোমরা ? সেদিন তো সাক্ষী শুধু বিশ্বাস আর পুরোহিত আদর্শ। তবু কোন্ দিন যেন ? ওফ্, তারিখটা তোমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। কবে ? কবে ? কবে শ্রবণা আর তুমি নিজেদের জন্য একটা রাত…! ধুত্তোর, এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ? ভাবো। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো। একাত্তর সেপ্টেম্বরের ফসল বাহাত্তরের ডিসেম্বরে কখনই উঠতে পারে না। আহ্, রিলিভড্। বেঁচে গেলে। কুলকুল করে চোরা স্রোত নেমে যাচ্ছে শিরদাঁড়া বেয়ে। এবার কৌতূহল। একটু একটু যন্ত্রণাও। শ্রবণা কিন্তু আর কিছুই বলছে না। তুমি হাঁপিয়ে উঠছ। তোমার মারুতি বালিগঞ্জ সারকুলার ঘুরে এখন গুরুসদয় রোডে। মিলিটারি বনানীর দিকে চোখ রেখে তুমি শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করেই ফেললে,

—তোমার বাড়িতে কে কে আছেন ?

বুদ্ধিমতী শ্রবণার চিবুকের ভাঁজ অবিকল আগের মত কঠিন হল.

—আমি, আমার ছেলে, আর একটা কাজের লোক।

—বিয়ে করোনি ?

নির্বোধ প্রশ্ন। শ্রবণা জবাব দিল না। ওহ্ অর্ণববাবু, বেশি ঘাঁটানোর দরকার কি ? চুপচাপ গাড়ি চালাও না। অযথা কেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার করবে ? বরং মানে মানে গড়িয়াহাটের মোড়ে নামিয়ে দাও পাপের বোঝাটিকে। হাতে সময় আছে। তোমার মারুতির পিক আপ্ দারুণ। মিনিট পঁচিশের মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাবে।

ধ্যাৎ, গোঁয়ারের মত তবু গড়িয়াহাট পেরিয়ে এলে। কোন মানে হয়? লক্ষ করে দেখেছ এতটা পথ যেচে গাড়িতে লিফট্ দিচ্ছ, অথচ শ্রবণা তোমার সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেনি? এখনও? রাগ না হোক, তোমার অভিমান হওয়া উচিত। অর্ণব মুখার্জিরও তো কিছু বলার থাকতে পারে। সেলফ্ ডিফেন্স। আত্মপক্ষ সমর্থনের মৌলিক অধিকার তোমারও আছে। ভাবতে ভাবতে পুরো কভেনেন্টেড্ অভিমানে যাদবপুর বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি সাইড করে দিয়েছ। আর কাণ্ডটা দ্যাখো, কিছু বলার আগে শ্রবণা নিজেই নেমে গেল। যেন বুঝে-শুনেই···। পশ্চিমের হলুদ রোদে ভিজে যাচ্ছে ওর মুখ। দরজাটা ধরে এতক্ষণ পর এই প্রথম ভারী সুন্দর হাসছে, —তোমার সময় নষ্ট করলাম।

তুমি চুপ।

পারলে একদিন সময় করে বাড়িতে এসো। তোমার যোধপুর থেকে যাদবপুর আর কতটুকু। বলতে বলতে নিজেই ঠিকানা বলছে, বউ আর ছেলেকেও এনো। খোকন লোকজন দেখলে খুব খুশি হয়। একেবারে একা একা থাকে তো। তবে বাপু আগেই বলে রাখি আমার আস্তানা কিন্তু সরু গলির ভেতর। তোমার গাড়ি ঢুকবে না।

আবার তোমার ধাক্কা খাওয়ার পালা। শ্রবণা তাহলে তোমার সব খবরই···! তুমি মনে মনে হেরে যাচ্ছ। জেল থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজেছিল মেয়েটা! সজোরে দরজা খুলে গাড়ি থেকে আচমকা নেমে এসেছ। চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়েছ শ্রবণার মুখোমুখি,

—তোমার পায়ে কি হয়েছে? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না কেন?

শ্রবণার হাসি নিভেছে। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তোমার অশান্ত মুখটার দিকে, জেনে কী লাভ?

—আমি জানতে চাই। তুমি অধৈর্য ভাবে মাথা নাড়ছ, —সব জানতে চাই।

শ্রবণার স্থির চোখে আবার ফুটে উঠছে ধারালো ভঙ্গি, চিবুক কঠিন, তোমাকে কোনদিন নরকে যেতে হয়নি অর্ণব। তুমি কি করে

জানবে পুলিশ লকআপে······বলতে বলতে থামল একটু। গলা নামাল, এ সমস্তই তোমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আর পুলিশের তরফ থেকে উপহার পেয়েছি আমি। আমার ছেলেটাও।

২

ফোনটা বাজছে। বেজেই চলেছে। বাজতে বাজতে থেমে গেল। আবার বাজছে। আবার। স্বর্গের দোহাই অর্ণব, ওঠো। অত করে কেউ ডাকলে বুঝতে হবে কলটা আরজেন্ট। অশোকদের পার্টি থেকে রাকা ডাকছে কি! ড্রাইভার ছোকরা নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে পৌঁছয়নি। মালিকের কাছ থেকে ঘণ্টা তিনেক টাইম পেয়ে নির্ঘাৎ কোথাও মাল খেয়ে উল্টে পড়ে আছে। সাচ্চা মালিকের সাচ্চা ড্রাইভার। এই সব প্রলেতারিয়েতগুলো শালা চুল্লু টেনেই নিজেদের শেষ করল। বেটাদের শ্রেণীচেতনা ঢুকবে কোন পথ দিয়ে? কিন্তু তোমার রাকাই বা কি! ন্যাকামি না করে যার হোক গাড়িতে ফিরতে পারে। ইনফ্যাক্ট ফেরেও অনেক সময়। তবুও অবিশ্রাম কিরিরিং কিরিরিং কেঁদে চলেছ দ্যাখো। একদম কান দেবে না। তার থেকে হ্যাভ্ সাম্ মোর ব্লাডমেরী। রঘুর হাতে এ মালটা দারুণ তৈরি হয়। ওয়া, কী ফাইন কালার। নির্ভেজাল রক্ত। রক্ত··· রক্ত···কমরেডস্ দিন এসেছে রক্তের ঋণ শোধ করার। তোমাদের কর্তব্য এখন গ্রামে গিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা। অশিক্ষিত গরীব মানুষগুলোর কাছে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তোমাদেরই। তোমরাই তাদের দেখাতে পারো মুক্তির [illegible] পান করো অর্ণব। আরেকটু ব্লাডমেরী ঢালো গলায়। পানেই শক্তি। পানেই মুক্তি। চোরের মত পালিয়ে এসেছ শ্রবণার বাড়ি থেকে। ষোল বছরের নিষ্পাপ কিশোরীটিকে দেখে কেন্নোর মত গুটিয়ে গেলে! তোমার মনের অত জোর-টোর সব গেল কোথায়! তারপর থেকে অবিরাম পান করে চলেছ। [illegible]। পালানোর রাস্তাটা কী সহজ। অশোকের বাড়ির পার্টিতেও গেলে না। কাল নরেন্দ্রপুরে বাম্পাকে দেখতে যাবে তো তোমার ছেলে?

গ্লাসের মধ্যে একদৃষ্টে কী দেখছ অর্ণব? চমকে উঠে মুখ ঢাকলে যে! কী দেখলে ব্লাডমেরীতে! রক্ত, না শ্রবণা? সুকান্ত,

না হিমানীশদা? তোমার তো কোনদিন ভূতের ভয় ছিল না। নাকি রঘুর গপ্পো শুনে তোমারও মাথায় ঢুকেছে ব্লাডিমেরীতে মৃত মানুষের মুখ ভেসে ওঠে। দূর দূর, আরেক সিপ্ মেরে দাও। ঝাঁঝালো রক্ত যত নামবে কণ্ঠনালী বেয়ে, বিবেক তোমার তত জাগতে থাকবে। বিবেক…বিবেক…আমাদের দেশের সত্তর ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে! গরিব চাষীদের সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল বেশিটাই নিয়ে নেয় মহাজনেরা। এসবই আধা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির কুফল। যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সোচ্চার হতে হবে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে। শ্রীকাকুলামের আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আমরা জেনেছি বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। চিহ্নিত করো সমস্ত শ্রেণীশত্রুদের… ওহে অর্ণব, এই মুহূর্তে তোমার একমাত্র শ্রেণীশত্রু ওই অলিভ গ্রীন টেলিফোনটা। টিঙটিঙ নাচছে দ্যাখো। যেন ক্যাবারে ডান্সার। স্ট্রিপটিজ্ দেখাবে। মনে হয় ওটা রাকার ফোন নয়। রাকার কাছে তুমি কি এতটাই জরুরী? আর কার হতে পারে? হ্যাঁ, তোমার এম ডি কিম্বা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। কিন্তু এটা তো তাদেরও ঘণ্টা বাজানোর সময় নয়! লেবাররা মালিকপক্ষের ধান্দাবাজি টের পেয়ে রাতারাতি ফ্যাক্টরি রেড করল নাকি! ইম্‌পসিবল্। সে যুগ এখনও দূরে অস্ত। বেজে যেতে দাও। রাত মাত্র যুবতী হয়েছে। একটু আগে তোমার জার্মান কাক্কু পিকাপিক ডাক ছাড়ল এগারবার। এই তো মাতাল হবার সময়।…মাথার ভেতর মদ গাঢ় হলে…সমস্ত শরীর মদে ভিজে গেলে, পাঁড় মাতাল, আকাশের দিকে [illegible] করে ছুঁড়ে দাও এক ডজন কাচের গেলাস।….

তোমার রাতের সঙ্গে তোমার বিকেলের কত তফাৎ আজ। পোষমানা লিটিগনের মত শ্রবণার পিছু পিছু গিয়েছিলে যাদবপুরের দশ ফুট বাই আট ফুট ঘরটায়। বাড়িতে ঢুকেই শ্রবণা কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল। মুখের সেই গনগনে আঁচ মরে ছাই। ব্যাগ থেকে টুকটাক ওষুধপত্র ফলমূল বার করে রাখল তার জালঘেরা মিটসেফের মাথায়। তারপর দরজায় নিশ্চল তোমাকে ডাকল ম্লান গলায়, —এসো।

পাশের আট বাই আট ঘর জুড়ে পাতা বিশাল এক চৌকিতে

শুয়ে আছে পঙ্গু ছেলেটা। জানলার দিকে মুখ। ওটুকু জান দিয়ে ছেলেটা কি আকাশ দেখতে পায়! তোমার নিশ্বাস বন্ধ হ আসছিল। ভাগ্যিস পা দুটো পাতলা চাদরে ঢাকা, নইলে তু বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যেতে। শ্রবণা গভীর স্নেহে হাত রাখল ছেলে মাথায়, —খোকন, তোমার কাছে একজন এসেছেন।

কী ঝকঝকে চোখ ছেলেটার। মণি দুটো যেন স্বচ্ছ ঝরণা জলে পড়ে থাকা অমূল্য দুটো পাথর। শ্রবণার থেকেও তীক্ষ্ম মু নাক! ঠোঁটের ওপর বয়ঃসন্ধির সবুজ আভাস। মাথাভরা রেশ চুল। বড় বড় চোখ ছড়িয়ে তোমার দিকে একটু সৌজন্যের হা হাসল। পরক্ষণেই ব্যস্ত জিজ্ঞাসা মার দিকে,—কাজ হল?

—দাঁড়াও, সবে তো অ্যাপ্লিকেশন দিলাম। কবে সেটা নড়াচ করে দ্যাখো।

—হুঁ। এখন তো শুধুই অপেক্ষা। ছেলেটার ভাঙা গ দিয়ে শব্দ কটা যেন ছিটকে ছিটকে এল। তোমার মনে হল কান্না কান্না কেন? মাঝে মাঝে উপহাসও কান্নার মত শোনায়।

শ্রবণা অপ্রস্তুত মুখে একখানা বেতের মোড়া এগিয়ে দিল,

—দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।

ছেলেটা এবার তোমাকে লক্ষ করছে ভাল করে। তুমি প্রা আর্তনাদ করে উঠলে,—নাহ্, আজ যাই। পরে আসব। আসলে একটা জরুরী কাজ…

আশ্চর্য! তুমি জানতে পর্যন্ত চাইলে না কিসের দরখাস্ত করেছে ওরা। কিসের অপেক্ষায় আছে রুগ্ন ছেলেটা? চিকিৎসার? কো মানুষের? না নতুন করে ফেরে আশার…?

কাওয়ার্ড, সেলফিশ অপূর্ব মুখার্জি, ওখানে দু মিনিট দাঁড়ি থাকার সাহস তোমার হল না আর এখন মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে ভা বিলাস হচ্ছে! পেগের পর পেগ ব্লাডিমেরী। ডিভানে শুয়ে পি ফোটাচ্ছ বিবেকে! ভাবের ঘরে চুরি! মনে নেই শ্রবণা বলত— অপূর্ব, আমাদের মধ্যে তোমার রক্তই কিন্তু সব থেকে বেশি নীল ভাবের ঘরে চুরি করার চান্স কিন্তু তোমারই বেশি।

ফোট! রক্ত আবার নীল কিরে? রক্ত হল ব্লাডিমেরী।

তোমার পিতৃপিতামহের রক্ত। তোমার গ্রেট বুর্জোয়া ফাদারের রক্ত। ...সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তা শ্রেণীবিরোধ দূর করেনি। এ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণীর...

অনারেবল্‌ জাস্‌টিস্‌ অফ্‌ পীস্‌ পি কে মুখার্জি বলছেন—অনেক রেভোলিউশন দেখানো হয়েছে। এনাফ ইজ এনাফ। কাল ভোরের ফ্লাইটেই তুমি দিল্লি যাচ্ছ। তোমার ছোটমামা পালামে থাকবে। নেক্সট্‌ মর্নিং ইউ আর থ্রু টু মন্ট্রিল্‌। ঝুনু তোমার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে সেখানে। তুমি কিছু বলতে চাইলে, বুর্জোয়া ফাদার হাত তুললেন,—তোমাদের এই অতি বিপ্লবীআনাকে লেনিন কি বলেছেন জানো? শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা। নাথিং বাট খোকামি। তোমার জন্য আমাকে অনেক মুখ পোড়াতে হয়েছে... লাস্টলি মিণ্টুকে দিয়ে...চীফ সেক্রেটারিকে ধরে...উফ্‌, আমাদের এতদিনকার বংশগৌরব, তোমাকে নিয়ে আশা, অহংকার...

অসহ্য। ইনটলারেবল। কিছুতেই শ্রবণার কথা বলা গেল না। বলবে কি করে? সাহস ছিল? এ কী করছ! অ্যাশট্রেটা হঠাৎ ওভাবে আছড়ে ভেঙে দিলে যে! নিঃশব্দ ফ্ল্যাটখানা ঝনঝনিয়ে উঠল। রঘু নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। নইলে ছুটে আসত। এখন তোমার আক্রোশ হচ্ছে। কিন্তু কার ওপর? বর্তমান, না অতীত? অতীত, না বর্তমান? না শুধুই নিজের ওপর? ঢকঢক করে অতটা গিলে নিলে! মস্তিষ্কের ভিডিও ক্লিপিংটাকে ঠিক করতে পারছ না। দুমদাম ছবি জাম্প করছে।

...সুকান্ত উত্তেজিত পায়চারি করছে পল্লবীদের ভেতর দিকের বন্ধ ঘরে,—হিমানীশদা, মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে আমাদের। এত তাড়াতাড়ি শহরে অ্যাকশান শুরু করাটা ঠিক হয়নি।

হিমানীশদা, দ্য ডেডিকেটেড ক্যাডার, সোফায় টান হবার চেষ্টা করলেন। ধরমপুরের কাছে এনকাউন্টারে জখম হয়েছিলেন। ভাল মতন চিকিৎসা হয়ে ওঠেনি। —না সুকান্ত, এখন আর আমরা কোনভাবেই জেলা কমিটির নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। অন্ধ্রের সমস্ত লীডার আর কাডার খুনের বদলা নিতে এখুনি এখানে পুলিশ, মিলিটারী, পুঁজিপতি আর চোরাকারবারীদের খতম

করা দরকার।

—আমি আবার বলছি, আমরা আসল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাচ্ছি। বিপ্লবের থেকে বিপ্লবী আনাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে।

…বলত না? বলত না এসব কথা ওরা? আর দোষ সব এই অর্ণব মুখার্জির! একদল প্রাণপণে বোঝাচ্ছে মূর্তিভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে দুই-মূর্তির লড়াই। এবং দুই মূর্তির লড়াই হচ্ছে আসলে দুই রাজনীতির লড়াই। দুই শ্রেণীর লড়াই। আর ওদিকে আরেক দল বলছে গান্ধী এবং গান্ধীবাদ বিপ্লবী রাজনীতির বাধা। সেজন্য গান্ধীমূর্তি ভাঙা চলতে পারে কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রবীন্দ্রনাথ বা বিদ্যাসাগরদের মত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মূর্তি ভাঙা অনুচিত। একদল বলছে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো। অন্যদিকে চলছে মারিঘেলার কায়দায় শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা। বৃথা মাথা গরম কোরো না অর্ণব, তোমাদের তখন কিছুই করার ছিল না। হিমানীশদার মত মানুষই কেমন শেষে বোবা মেরে গেলেন। সুকান্তকে থেঁতলে থেঁতলে মারা হল। তোমার তখন মস্তিষ্কই কাজ করত না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র নষ্ট করা উচিৎ, কি উচিৎ না, এই তো শেষে দাঁড়াল গিয়ে মূল সমস্যা। বিপ্লব আর কোথায় সেখানে? তার ওপর সে সময় ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে দিয়েছিল পুলিশ, সি আর পি। সব কটা পার্টি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তোমাদের ওপর। তাদের কে যে গোলাপী, কে যে গেরুয়া, কে যে লাল!

দূর দূর দূর। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে খতম অভিযান চালাতে গিয়ে লাস্ট তোমাদের শত্রু গিয়ে দাঁড়াল কারা? না, কোন জোতদার, ভূস্বামী নয়, কিছু নিরীহ ছাপোষা কনস্টেবল, সেপাই। 'পুলিশের প্রতি' বুকলেটের কী সাংঘাতিক পরিণাম হাতে নাতে টের পেয়েছ। আরে বাবা, সিস্টেম আমূল পাল্টে দেওয়া অত সোজা! সংগঠন নেই! মাস কন্টাক্ট নেই। যত সব রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারিজম্। তবে? তবে?

মনট্রিলে বসেই তুমি খবর পেয়েছিলে শহরে অ্যাকশন বন্ধ করার নির্দেশ এসে গেছে। ব্যাস, খেল খতম! শয়ে শয়ে ছেলে সব হজম। সুকান্ত, মিহির, অরিন্দম, কেউ রইল না। সঞ্জয়ের শির-

দাঁড়াটাই নাকি পুরোপুরি বেঁকে গেছে। পল্লবীর মত তেজী মেয়ে ফুরিয়ে গেল। আর শ্রবণার পেটে এল পঙ্গু ছেলে। তবু এত কিছুর ফলে কিছু একটা কি তৈরী হয় না? অতগুলো ছেলের বিশ্বাস, আত্মদান, রক্ত কি কোন ইতিহাসই তৈরী করে না? করে। করে। কে যেন তখন লিখেছিল…মনে রেখো, আমরা এসেছিলাম… আঠারো শো সাতান্নর রাতে আমরা ছুটন্ত ঘোড় সওয়ার…

না অর্ণব। ব্লাডিমেরীর লাথিটা আজ একটু বেশিই হয়ে গেছে। নাহলে পাক্কা পাঁচমিনিট ধরে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে রাকা আর তুমি বিড়বিড় করে চলেছ…মনে রেখো…হে আমার স্বদেশ, আমার স্বকাল, ভাবীকাল…

—ও হেল্। সেই সন্ধে থেকে বসে তুমি ড্রিংক করে চলেছ, রাকা ত্বরিত পায়ে কাছে আসছে। উঁহু, উঠতে চেষ্টা কোরো না। তোমার ডান পা জড়িয়ে ধরছে বাঁ পাকে। চারদিকে ছড়িয়ে অসংখ্য কাচ। সাবধান। নিজের ভাঙা কাচে নিজেই যে…। মৃদু আলোতেও কাচের টুকরোগুলো ঠিক চোখে পড়ে গেছে রাকার। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেছে দেওয়ালজোড়া ইউনিটটার সামনে,—তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো? এভাবে বাড়িতে বসে গেলার জন্যই আজ অশোকদের ওখানে গেলে না? প্রত্যেককে কৈফিয়ত দিতে দিতে আমি…

তুমি পিট পিট তাকাচ্ছ। তোমার ঝাপসা চোখে দুলে উঠল নারী মোহিনী। তোমার স্ত্রী। লাইফ পার্টনার। ম্যাজেন্টা শিফনের আঁচল খসে পড়েছে বাঁ হাতের কোলে। উত্তেজনায় ঢেউ তুলছে উদ্ধত বুকদুটোতে। ঝুলন্ত মফচেনে তারই হালকা দোলা। তুমি হাত বাড়াবার চেষ্টা করলে। নিজের হাত নিজের কাছেই ফিরে এল,—সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি…

—হরিবল্। রাকা দুপদাপ পা ফেলে বড় আলো জ্বালাল, —রঘু কোথায়? রঘুউউ…চিৎকার করতে করতে কোমরে আঁচল জড়াচ্ছে। সুন্দরী ভুরুতে চাপ চাপ বিরক্তি। ভ্যানিটি ব্যাগ সোফায় ছুঁড়ে দিল। পেন্সিল হিলে কাচ গুঁড়িয়ে তোমাকে এসে জাপটে তুলছে,—খুব হয়েছে। এদিক দিয়ে এসো। হ্যাঁ, এখান দিয়ে…আহ্ কাচে পা কাটবে যে…এমন সব কাণ্ড করো মাঝে

মাঝে। রঘুকেও বলিহারি যাই…'

রাকার পেলব কাঁধে ভর দিয়ে তুমি বেডরুমে আসছ। আজ কোন্ পারফিউমটা মেখেছে রাকা? তোমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। বিছানায় বসে পড়ে তুমি প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরেছ রাকার কোমর। ডুবন্ত গলায় মুখ ঘষছ ওর বুকে, আমাকে বাঁচাও রাকা…প্লীজ…। আয়াম গেটিং লস্ট্।

—ঠিক আছে। শুয়ে পড়ো।

—নো। আই ওয়ান্ট্ টু ডু সামথিং। সামথিং ফর মাই পুওর ওয়াইফ, মাই সীক চাইল্ড্।

—কী আবোল তাবোল বকছ? রাকা তোমার ঘন চুলে আঙুল ডোবাল,—তোমার হয়েছেটা কি বলো তো? বিকেল থেকে এমন ছটফট করছ কেন?

—জানি না। তুমি বুঝি এই আদরটার জন্যই অপেক্ষা করছিলে। এরকমই সঙ্গ চাইছিলে কারুর। হু হু করে কেঁদে ফেললে,—আমি রিয়েলি ওদের জন্য কিছু করতে চাই।

—কাদের জন্য?

—বললাম তো। আমার স্ত্রী। ছেলে।

রাকা হেসে ফেলল,—নাহ্, তোমার দেখছি আজ সত্যিই মাথার পোকা নড়েছে। কাম অন্। লক্ষ্মী ছেলের মত শোও তো দেখি। কাল সকালে বাপ্পার কাছে যেতে হবে। তারপর দুপুরে ফিরে টার্ফ ক্লাব। তুলতুলিরা সবাই কাল মাঠে আসবে বলেছে মনে আছে তো?

তুমি শিশুর মত ঢুকঢুক মাথা নাড়লে। তোমার থুতনি একহাতে ধরে অন্যহাতে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে রাকা।

—আর কখখনো একা একা ড্রিংক করবে না। একা খেলেই তোমাকে ভূতে ধরে। ইউ সিম্পলি গো ম্যাড আফটার…

তুমি ফুঁপিয়ে উঠলে,—আমাকে সবাই ছেড়ে চলে গেছে। সব্বাই। আই দা মোস্ট ডার্টি ফেলো দা রেনিগেড…

—কে বলেছে? আমি আছি। চকচকে গোলাপী ঠোঁট তোমার কপালে ছোঁয়াল রাকা। চোখে উথলে পড়ছে মমতা। মেয়েরা বোধহয় সকলেই মাঝে মাঝে এরকম মা হয়ে যায়। নরম-স্নিগ্ধ।

তুমি সেই স্নিগ্ধতার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে ফিরছ। যৌবন থেকে রাকায়।

—দ্যাখো তোমার কান্নায় আমার ব্লাউজ ভিজে গেছে। নটি বয়।

রাকা ঠোঁট টিপে হাসছে। তুমি আধবোজা মাতালচোখে প্রাণ ভরে সুন্দরী স্ত্রীকে দেখছ। গুড্। এই তো বিচক্ষণতার লক্ষণ। অতীত ঘেঁটে কেঁদে মরে কাপুরুষেরা। ওয়েক আপ্। দ্যাখো রাকার কী সুন্দর তেলতেলে হলুদ ত্বক। রিসেন্টলি বোধহয় ওয়াক্সিং করিয়েছে। শ্যাক করা সিল্কি চুল বেয়ে নামছে সুগন্ধ। দেহের প্রতিটি খাঁজ স্পষ্ট, মসৃণ। পারফেক্ট ফেমিনিন ফিগার। তার পাশে কাকে বসাও তুমি? ক্ষয়াটে চেহারার আধবুড়ি শ্রবণা দিদিমণি? ভুলে যাও ডিয়ার। ভুলে যাও। এই তো ভাল ছেলের মত শুয়ে পড়েছ বিছানায়। তুলতুলে খেলনাটাকে দেখছ নেড়ে চেড়ে। শান্তি। নেশা এবার ঘুম হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। ঘুমোও অপূর্ব। ব্লাডিমেরীর মত অধর মদিরা পান করতে করতে তলিয়ে যাও ঘুমে।

৬

—আসুন, আমরা তবে আজকের আলোচনা শুরু করি। নাম্বার ওয়ান, শিফটিং অফ্ আওয়ার টু ডিভিশনস্ ফ্রম ক্যালকাটা টু ফরিদাবাদ। লাস্ট্ মিটিংএ ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত আপনারা জেনেছিলেন। দেখুন, আমি আজ আপনাদের আরও ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা বোঝাতে চাই। তিনটে মেইন সুবিধে আমরা কলকাতার থেকে ফরিদাবাদে বেশি পাচ্ছি। গভর্নমেন্ট ইনসেনটিভ'র মেটিরিয়াল অ্যান্ড পাওয়ার। দিনে দিনে সিচুয়েশন এখানে এমন দাঁড়িয়েছে যে কম্পানীর পক্ষে ব্যবসা করাই দুরূহ হয়ে পড়ছে। হিউজ লস্। তাই কম্পানী ডিসাইড করেছে ইনস্ট্রুমেন্টেশন আর অ্যালায়েড মেশিনারী [illegible] এই দুটো ডিভিশনকে পুজোর পর ফরিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের হিসেব বলছে দুটো ডিভিশন মিলিয়ে আমাদের ওয়ার্কার আছেন তেষট্টিজন। এই তেষট্টি জনকেও প্লেস করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। এই

তেমাট্রিজনই যদি চান তো ফরিদাবাদে চলে যেতে পারেন। আমরা তাঁদের ডেফিনিটলি কিছু মার্জিনাল বেনিফিট দেওয়ার চেষ্টা করব। আইদার ইন টার্মস অফ স্যালারি অর ইন টার্মস অফ্ ইনসেনটিভ্। অ্যান্ড ইফ পসিবল্ বোথ। তা নাহলে উইথ ফুল রিটায়ারমেন্ট বেনিফট আমরা তাঁদের ছেড়ে দিতেও রাজি আছি। ডু আই বোর ইউ?

বাহ্, দারুণ গুছিয়ে, কী অনায়াসে পর পর কথাগুলো তুমি বলে যেতে পারছ মুখার্জি। এই তো চাই। টেবিলের উল্টোদিকের লোকগুলো কেমন পণ্ডিতের মত ভুরু কুঁচকে বসে আছে দ্যাখো! এই সব লেবার লিডার গুলোর ভাবভঙ্গি এমন যেন তিন ভুবনের ভার ওদের ওপরেই দেওয়া রয়েছে। শুধু চোখা চোখা শব্দ সাজিয়ে ওরা পৃথিবীর সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারে। তুমি অ্যালার্ট থাকো। ঠিক উল্টোদিকে যে লোকটা বসেছে, ধুতিশার্ট, মাথায় হাল্কা টাক, ওকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। লোকটিকে পাল্টি খাওয়ানো যায়। তার পাশে রোগা লিকলিকে বুশ শার্ট, জিনস্ প্যান্ট, ওকেও লাইনে আনতে পারবে। প্রবলেম তোমার বাঁ দিকের চশমা-পরাকে নিয়ে। দীপেন বিশ্বাস লোকটা পার্টির হোল টাইমার। প্রচণ্ড ধূর্ত। জারোয়া টাইপ। বিষতীরের মত ডায়ালগ ছুঁড়তে জানে। তার থেকেও বড় কথা লোকটা তোমার সম্পর্কেও অনেক খোঁজখবর রাখে। মানে তোমার অতীত বর্তমান সম্পর্কে আর কি। আগের মিটিং-এ কুরুভিলাদের বিশ্রীভাবে নাস্তানাবুদ করেছে। চোখ মুখ দেখে মনে হয় আজ তোমাকেও ছাড়বে না। বাকি দুজনও চালাক তবে তেমন খতরনাক নয়। অনেক সময় ম্যানেজমেন্টের আসল চালটা বুঝেও না বোঝার ভান করতে পারে। তোমারও আজ কর্তব্য ওদের কোন কিছুই বলতে না দেওয়া। পরপর তিনটে বড় এক্সপোর্ট কনসাইনমেন্ট্ স্ট্যাকড্ হয়ে আছে। শিপ্‌মেন্ট্ হচ্ছে না। এ অবস্থায় কিছুদিন প্রোডাকশন্ ডিটেনিং খুব জরুরী। এ এক অদ্ভুত সংকটের মুহূর্ত। ···এই সব সংকটের ফলে এক মহামারী হাজির হয়। এই মহামারী অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়।······মার্ক্সের লাইনগুলো যেন এডবার্গ ইণ্ডিয়ার জন্যই লেখা

হয়েছিল। তবে দীপেন বিশ্বাসকে তো সেটা বুঝতে দেওয়া চলবে না। তার চেয়ে বরং রিভলভিং চেয়ার আলতো ঘোরাও। লোকটার চোখে চোখ রাখো।

—'নাউ কাম টু দা সেকেণ্ড পয়েন্ট। মেকানিকাল উইং-এর তিনজন ওয়ার্কার সম্পর্কে বলছি। ওদের মধ্যে দুজন আপনাদের ইউনিয়ন করেন, একজন ওনাদের।' বলতে বলতে চোখের মণি দুটো ধুতি শার্টের শরীরে বুলিয়ে নিলে,—'তিনজনের সম্পর্কেই অভিযোগ আছে গ্রস্ ইন্ডিসিপ্লিনের। অ্যান্ড ইউ নো হাউ আওয়ার কম্পানি লুক্স্ অ্যাট্ ইনডিসিপ্লিন। ওদের চার্জশীট দিয়েছি। দরকার হলে…'

—'না।' দীপেন বিশ্বাস এতক্ষণে মুখ খুলল। এই লোকগুলোর টাইপই যেন কিরকম। আগে তোমাদের গড়গড় করে কিছু বলে যেতে দেবে তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারবে। মাঝে মাঝে এত দুর্বোধ্য লাগে লোকগুলোকে! না শব্দটা বলার পরও আধ মিনিট চুপ মেরে রইল। ব্যক্তিত্ব শানাচ্ছে—'আমরা মনে করি এ ধরনের চার্জশীট দেওয়াটা বেআইনী। ম্যানেজ্মেণ্ট্ কখনই কারুর ওপর আন্ডিউ ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারে না। আপনারা যে রিজন্গুলো দেখিয়েছেন সেগুলো প্রায় সবই ভেইগ্। চার্জশীট আপনাদের উইথড্র করতে হবে।

ধুতি শার্ট উত্তেজিতভাবে সায় দিল,—'সবই এক ধরনের চাল। আমাদের কাছে স্যার খবর আছে আপনারা রীতিমত জুলুম করে…'

থ্যাংক গড্। ওষুধ ধরছে। তুমি কুরুভিল্লার দিকে আড় চোখে তাকালে। কেরালাইট মানুষটি অসম্ভব গম্ভীর মুখে ফাইল দেখার ভান করছে। আর চীফ পারসোনেল স্যান্যাল চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে চুলে আঙুল বুলিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ম্যানেজমেন্টের অর্ডার অনুযায়ী ওরা আজ এ কে মুখার্জি, চীফ এক্সিকিউটিভ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে মদত দিতে বসেছে। অবশ্য ওদের তেমন দরকার ছিল না। তুমি তো একাই একশ। সমর দাশগুপ্তকে মাঝপথে থামিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে হেসে উঠেছ,—'কাম অন মিস্টার দাশগুপ্ত। ওয়ার্কারদের সঙ্গে কম্পানির কোন শত্রুতা

নেই, থাকতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি আপনারাই তো সব। আই মিন ওয়ার্কাররা। আপনারা চালাচ্ছেন, তাই আমরা চলছি। খেয়ে পরে বেঁচে রয়েছি। কিন্তু তার মানে কি এই, যে সব রকম স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায় আক্রমণ সব সময় ম্যানেজমেন্ট্‌কেই সহ্য করে যেতে হবে? বলুন। বলুন।'

অনিল মণ্ডল নড়ে চড়ে বসল,—'ঠিক আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। আগে প্রথম ইস্যুটা নিয়েই আলোচনা হয়ে যাক।'

কুরুভিলা তোমার কানের পাশে ঝুঁকে ফিসফিস করল,—'ইউ নো দ্যাট পারসন্‌ ইজ্‌ ইন্‌ অ্যালায়েড মেশিনারি।'

তুমি মাথা দোলালে।

মণ্ডল বোধহয় কথাটা আঁচ করেছে। সামান্য অপ্রস্তুত ভাবে সঙ্গিদের দিকে তাকিয়ে নিল,—'আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে আমি নিজে ইন্‌ভলভ্‌ড্‌ বলে ...'

—'ছি ছি, এ কী বলছেন?' তুমি অমায়িক হেসে ফাইভ ফিফটি ফাইভ্‌ এগিয়ে দিলে টেবিলের উল্টো দিকে,—'ডেফিনিট্‌লি ফার্স্ট ইস্যুটা বেশি সেন্সেটিভ্‌। এটা নিয়েই আগে কথা হওয়া উচিৎ। কম্পানির সুবিধে অসুবিধের সঙ্গে আপনাদের ভালমন্দও ভেবে দেখতে হবে বইকি। আপনাদের বক্তব্য আপনারা বলুন!

—'কথাটা তাহলে সোজাসুজি বলি', দীপেন হাত নেড়ে তোমার সিগারেট রিফিউজ্‌ করল,—'আপনাদের প্রপোজাল আমরা স্টাডি করে দেখেছি। অনেকগুলো বড় বড় ফাঁক আছে। আমরা মনে করি এখনই দুটো ডিভিশন সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মোটেই প্রয়োজন নেই। আপনারা যে প্রবলেমগুলোর কথা বলছেন তা নিয়ে আমরা স্টেটের সঙ্গে ট্রাইপার্টাইটে বসতে পারি। দরকার হলে ইন্টার্ণ জোনের কোটার ব্যাপারে আমরা সেন্ট্রাল মিনিস্টারের সঙ্গেও...'

—'দ্যাটস্‌ ভেরি গুড।' সামন্ত দু আঙুলে নিজের ঠোঁট টানাটানি করছে,—'কিন্তু এখানে পাওয়ারের ব্যাপারে গ্যারান্টি বোধহয় স্বয়ং ভগবানও দিতে পারেন না। সেটিং অ্যাসাইড দি ইনসেন্‌টিভ্‌স্‌ উই আর গেটিং অ্যাট্‌ ফরিদাবাদ।'

কুরুভিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে পয়েন্টটা অ্যাপ্রেশিয়েট করল।

আরে বাবা ভ্যানতাড়া করার দরকার কি? একস্ট্রা কথা বলা মানেই প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেওয়া। তুমি ঝটপট বলে উঠলে,—'দেখুন, এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত ইজ্ ফাইনাল। আপনারা এখন আলোচনা করে দেখতে পারেন হাউ মাচ ইউ ক্যান···।

—'কিন্তু ম্যানেজমেন্ট্ হুইমজিকালি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আমরা এই শিফ্টিং-এর ঘোর বিরোধিতা করছি।'

—'আপনি রেগে যাচ্ছেন মিস্টার বিশ্বাস।' তুমি আবার মধুর হাসি ফোটালে ঠোঁটে,—'এভরিথিং ইজ ফাইন দেয়ার। ফরিদাবাদের ওয়েদার চমৎকার···'

—'ওসব হাওয়া বদল-টদল আপনাদের মানায়।' বিশ্বাস ঝাঁঝ ছড়াল,—'আপনারা জায়গামতন খাপে খাপে নিজেদের বসিয়ে নিতে পারেন। কথায় কথায় চামড়ার রঙ বদলাতে পারেন। আমরা পারি না।'

আপনি কী মীন্ করতে চাইছেন? তুমি বলতে গিয়েও প্রাণপণে সামলে নিয়েছ। লোকটা মাঝে মাঝেই এভাবে তোমার দিকে বিদ্রূপ ছেটায়। ছেটাক গে যাক। খবরদার মাথা গরম কোরো না। ওদের আজ বাড়তে দাও।···প্রয়োজনে ফ্রক কোট পরেও আলোচনার টেবিলে বসতে হবে যদি আমরা বিন্দুমাত্র সুবিধা হাসিল করতে পারি···এম-ডি, না লেনিন, লেনিন না এম-ডি? নার্ভের ওপর দখল আনো মুখার্জি।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেছে। সঙ্গে কিছু স্ন্যাকস্। কাজু, বিস্কিট্স্। ওদের মধ্যে দুজন কফিতে চুমুক দিল। আরও কিছু অর্থহীন কথা চালাচালির পর তিনজন উঠে দাঁড়িয়েছে,—'আপনারা যদি স্যার এভাবে অ্যাডামেন্ট অ্যাটিচিউড্ দেখান তাহলে কোন কথাই চলতে পারে না।'

—'অভিযোগটা একটু ওয়ান সাইডেড্ হয়ে যাচ্ছে না?'

—'না। ম্যানেজমেন্টের ডিকটেটোরিয়াল অ্যাক্টিভিটিস্ আমরা মানছি না। ফল্স্ চার্জশীট দিয়ে ছাঁটাই করার ধান্দাও আপনাদের ছাড়তে হবে। পুজোর আগেই নতুন এগ্রিমেন্টের খসড়া

চাই। ওয়েজ রিভিশন নিয়ে বহু দিন ধরে ধানাই-পানাই করছেন।'

'—তার মানে আমরা আপনাদের কোঅপারেশন পাচ্ছি না?'

তুমি সঠিক সময়ে সঠিকতর বাক্যটি প্রয়োগ করে দিলে,—'এবং এটাই বোধহয় আপনাদের শেষ কথা?'

এবার পাঁচজনই উঠে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজিত পাঁচ নেতা,—'ফাইনাল কথা বলবে শ্রমিকরা। আমরা তাদের জানাচ্ছি আপনারা কোনমতে মূল দাবী বিবেচনা করতে রাজি নন।'

তুমি পুরো গ্রেগরি পেক্ কায়দায় শ্রাগ্ করলে! লোকগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটাই তো চেয়েছিলে। ওয়েল ডান অর্ণব। এরপরই ফ্যাক্টরির গেটে স্লোগান শুরু হবে। জড়ো হবে শ্রমিকরা। বৃথাই গলা ফাটাবে। সেই সুযোগে তোমাদের খাম খাওয়া লোকগুলো কায়দামতন হুল্লোড় বাধিয়ে দেবে। সব কিছুই কম্পিউটারাইজ্ড্। প্রোগ্রামড্। কল দ্য পুলিশ। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গেটে নোটিশ ঝুলিয়ে তিন মাসের জন্য তালাবন্ধ। যা শালা তোরা যেখানে পারিস। লেবার সেক্রেটারি, চীফ মিনিস্টার সব দেখা হয়ে গেছে আমাদের। এখন সরকার চালায় আমাদের মালিকেরা। অ্যাবসোলিউট্ পাওয়ার। কোন লাল নীল রঙওলাদের শালা ক্ষমতা নেই চ্যাঁ ফোঁ করার। ভাত ছড়ালেই কাক মিলে যায় প্রচুর।

সান্যাল তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল,—'কনগ্র্যাট্স মুখার্জি!' বলতে বলতে চোখ টিপছে,—'তবে এম-ডি'র কাছে রিপোর্ট দেওয়ার সময় আমাদের নামটাও করবেন। আই মীন কিছুটা রোল তো আমরাও…'

কুন্তলা দক্ষিণী কায়দায় মাথা নাড়ল,—'ডোন্ট্ ক্রাই সান্যাল। ম্যানেজমেন্টের কাছে এক্স-কমিউনিস্টদের খাতিরই আলাদা।'

তুমি নির্বাক। লোকগুলোকে কিছুই বললে না উত্তরে। ঠোঁট চেপে আলতো হাসছ। হাসিটা কান্নার মত যেন। ওরা চেম্বার থেকে চলে যাওয়ার পর দু আঙুলে মাথা টিপে বসে আছ। হোলটা কী? অনুতাপ? অনুশোচনা? নাকি শ্রবণজনিত নস্টালজিয়া? অল বুলশীট। ওঠো! হেড অফিসে ফিরে বরং

এম-ডি'র আদর গায়ে মেখে নাও,—'মুখার্জি ভাগ্যিস তুমি কমিউনিস্ট্ ছিলে একসময়। তোমাদের মার্কসিস্ট্দের মত সিচুয়েশন ট্যাক্ল্ করতে আর কেউ পারে না। হা হা…'

এম, ডি'র হব্ হাসিটা ঝাঁঝ কানে ফুটছে। তুমি টেবিলে ঘুষি মারলে…তোমরা শিক্ষিত তাই তোমাদেরই পোঁছতে হবে অর্ধ-শিক্ষিত হতদরিদ্র মানুষগুলোর কাছে। তাদের চেনাতে হবে প্রকৃত শ্রেণীশত্রু কারা। কারা তাদের এক্সপ্লয়েট করছে…এই যে দালাল মুৎসুদ্দির দল…আহা করো কী মুখার্জি সাহেব? টেবিলে ঘুষি চালালে তোমার হাতেই লাগবে যে। বিবেক কামড়াচ্ছে? বিবেকবাবু এতদিন ছিলেন কোথায়? কাচের ওপর ঝুঁকে কাকে দেখছ? কোন্ অর্থব মুখার্জিকে? ভাল করে দ্যাখো তো সেই ছেলেটাকে দেখতে পাও কিনা। সেই বাইশ বছরের টাটকা যুবক! দুচোখে যার মায়াবী নতুন দেশ, চুল উসকো-খুসকো, গালজোড়া কচি নরম ঘাস! ছেলেটা শ্রবণার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বলছে,—"আমরাই প্রতিষ্ঠা করব শোষণহীন সমাজ। চিহ্নিত করব '

টেলিফোন অপারেটর মেয়েটি ডাকছে,—'মিস্টার মুখার্জি এম ডি ইজ্ অন দা লাইন।'

তড়াক করে উঠে বসেছ,—'ইয়েস স্যার।'

—'এনি নিউজ?'

—'এভ্রিথিং পারফেক্টলি অলরাইট স্যার।'

—'ভেরি নাইস। তুমি কখন হেড অফিসে আসছ?'

—'উইদিন টুয়েলভ্ স্যার।'

ফোন রেখে অন্যমনস্ক ভাবে ফ্যাক্টরির বাইরে আসছ। সাবাশ। এর মধ্যেই স্লোগান শুরু হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি লোকগুলোকে গেটে ওরা অরগানাইজ্ করল কিভাবে! ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে তোমার সামনে আনছে, সমস্বরে ধ্বনি তুলল ওরা।

—'দালাল তুমি নিপাত যাও। নিপাত যাও। নিপাত যাও।'

নিপাতিত হবে বইকি। এখন [illegible] গাড়ির ভেতর ডানলপিলোর গদিতে। তুমি চোখে সানগ্লাস চড়ালে।

'—মালিকের জুলুমবাজি মানছি না। মানব না।'

মেনো না ভাই। পরশু থেকে তিন মাস পেট চেপে বসে থাকো।

লক আউট নোটিশ ঝুলল বলে।

—'দালাল তুমি সাবধান। শ্রমিক আছে হুঁশিয়ার।'

বেশ। বেশ। গেট পার হওয়ার সময় দীপেন বিশ্বাসের সঙ্গে ফের চোখাচোখি হল। তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। ওরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে—'দুনিয়ার মজদুর এক হও।'—একশ চল্লিশ বছরের পুরোন শ্লোগান। তবু কী ধার! গোটা চত্বর গমগম করছে যেন। অনেকটা দূরে চলে আসার পরও বাজছে তার রেশ। বাজছে না, যেন হাতুড়ি ঠুকছে মাথায়। তোমার বুকটা কোন কারণ ছাড়াই টিপটিপ করে উঠল। ছাড় তো। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে দীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার। প্রয়োজন বলিষ্ঠ সংগঠনের। যথার্থ নেতার। হঠকারিতায় কোন কার্যসিদ্ধি হয় না। একবার তো দেখেইছ বালখিল্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের দিকে দ্যাখো। রাশিয়া, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, জার্মানি, চীন…। না হে না, ওভাবে হয় না। তবু কেন যে বুক কাঁপা থামে না তোমার! কেন যে একটা শুকনো মুখ বার বার মনে পড়ে। স্বপ্নে জাগরণে তাড়া করে এক পঙ্গু কিশোর।

তারাতলার মোড়ে এসে ডানদিকে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বললে। আবার ভূতটা নাচছে মাথায়।

—'এদিক দিয়ে কোথায় যাবেন স্যার?'

দশ আঙুলে নিজের চুল খামচে ধরেছ,—'যাদবপুর।'

[illegible] আজ বাইরের ঘরটাতেই রয়েছে। হুইল চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে কী যেন লিখছে। সামনে ছেঁড়া ন্যাতার মত ঝুলছে শুকনো দুটো পা। ঢলঢলে পাজামার ঠ্যাঙজোড়া লতপত টেবিলফ্যানের হাওয়ায়। উঃ, কী নিষ্ঠুর দৃশ্য। চারদিকে ছড়ানো জামা-কাপড়, বাসন। গোটা কয়েক বই-খাতা কাঠের র‍্যাকে এলোমেলো সাজানো। এক ঘর জিনিসপত্রের মধ্যে একদম একা হয়ে বসে আছে ছেলেটা। অজস্র [illegible] চুল কামড়ে ধরে আছে ওর কপাল, চোখ। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলে তুমি।

—'আরে আপনি? হঠাৎই চোখ তুলে অবাক হয়েছে

খোকন।

তুমি অল্প হাসলে,—'কেমন আছ ?'

—'ভাল।' ঝিকমিক হাসিতে ভরে গেল খোকনের মুখ,—'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? ভেতরে আসুন।' বলতে বলতে খাতা-কলমটা গুঁজে রাখল চেয়ারের খাঁজে,—'মা কিন্তু নেই। স্কুলে।'

—'আমি তোমার কাছেই এসেছি।' ওর সামনে মোড়া টেনে বসলে তুমি,—'কি লিখছিলে অত মন দিয়ে ?'

—'তেমন কিছু না।' খোকনের হাসিতে লজ্জা এল। মনে হয় কবিতা টবিতা। এই বয়সে খোকনদের বুকে তো শুধু কবিতাই থাকে।

—'চা খাবেন ? সরলাদি করে দিতে পারে।'

—'উঁহু। আজ শুধুই তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।' কাঙালের মত ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছ। কাউকে খুঁজছ কি ? সবুজ-সবুজ মনের কোন হারিয়ে যাওয়া কিশোরকে ? এক চিলতে জানলার বাইরে দুপুরের আকাশটা লটকে আছে কাটা ঘুড়ির মত। গরম বাতাস মাঝে মাঝে ঝাঁপ দিচ্ছে ঘরে। চারদিক স্তব্ধ, তরঙ্গহীন। এভাবেই সারাটা দুপুর একা-একা বসে থাকে নাকি ছেলেটা ? বান্ধবহীন ? নিঃসঙ্গ ? তুমি এদিক-ওদিক তাকালে, —'কি করো সারা দুপুর ? পড়াশুনো ?'

—'পড়ি। লিখি। চুপচাপ শুয়েও থাকি। কখনও কখনও দু-একজন বন্ধুবান্ধব আসে। স্কুলের।'

—'কোন্ স্কুল তোমার ?'

—'এখান থেকে কাছেই। রামচরণ বিদ্যাপীঠ।' খোকনকে আচমকা কেমন বিষণ্ণ দেখাল,—'মাধ্যমিক দিয়েছিলাম এবার। রেজাল্ট ইন্‌কমপ্লিট।'

—'সে কি ? কেন ?' তোমার স্বর জড়ো হল।

—'জানি না।' খোকন মাথা নামাল,—'মা অনেক ছোটাছুটি করেছে। মার্কসীটের জন্যে কিছুই হল না। কোন সাবজেক্টের খাতা-ফাতা মনে হয় হারিয়ে গেছে।'

তোমার শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। কী অবলীলায় কথাগুলো

বলে যাচ্ছে ছেলেটা। শ্রবণা তবে সেদিন সেকেন্ডারি বোর্ডের অফিসেই গিয়েছিল! তোমাকে একবারও বলল না কেন? ওখানকার ডেপুটি চক্রবর্তী তোমার এক গেলাসের দোস্ত। তুমি ব্যস্তভাবে ঝুঁকলে,—'তোমার রোল নাম্বারটা আমাকে দাও তো।'

—'কী হবে?' খোকন বিজ্ঞের মত ঠোঁট ওল্টালো,—'এখন যেভাবে কাজ হয়, তাতেই প্রতিবছরই কারুর না কারুর খাতা হারিয়ে যায়! কেউ কোথাও সিনসিয়ারলি কাজই করতে চায় না! জানেন, আমাদের স্কুলের দশজন ছেলের রেজাল্ট ইনকমপ্লিট।'

ছেলেটা বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে তো! প্রাজ্ঞ মানুষের মত! তুমি হেসে ফেললে,—'তবু দাও না। চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?'

পাতলা ঠোঁটে যেন হতাশ, কাঁপছে,—'পাস করেই বা কি হবে?'

সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তুমি ওর কাঁধ ছোঁওয়ার চেষ্টা করলে। সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ চোখে তোমার দিকে তাকিয়েছে ছেলেটা। তীক্ষ্ম জিজ্ঞাসা ফুটে উঠছে মুখে,—'আচ্ছা, আপনি কি এখনও বিশ্বাস করেন প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু কিছু পেটি বুর্জোয়া ক্লাসই তৈরি হয়?'

তুমি থতমত খেয়ে গেলে। ছেলেটা এসব বলে কী?

—'তুমি এসব জানলে কোথ্থেকে?'

—'মা-ই তো বলে। মার কাছ থেকে আপনাদের অনেক কথা শুনেছি।'

চাপা উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠছ। কী বলেছে শ্রবণা! ছেলেটা কি সারাক্ষণ শুধু ওই সব কথাই ভাবে নাকি! প্রতিক্রিয়াশীল! পেটি বুর্জোয়া! আসলে সঙ্গীসাথী বিশেষ নেই বলেই হয়ত…। বেরোতেও তো পারে না কোথাও। বাপ্পার কিছু স্লাইড ভেসে উঠছে তোমার চোখের সামনে। খোকনের থেকে ছোটই। এর মধ্যেই কী স্মার্ট, চৌকস। হাঁটা চলা সবকিছুতেই ঝকঝকে ভাব। মন্ট্রিলেই হয়েছিল। সাতাত্তরের সেপ্টেম্বরে। বাই বার্থ ওখানেও সিটিজেনশীপ আছে এখন। রাকার ইচ্ছে আর একটু বড় হলে ওকে আবার ওখানেই পাঠিয়ে দেয়। তোমার বাসনা অন্যরকম। কানাডার থেকে স্টেট্সে গেলে অনেক বেশি…

—'কী ভাবছেন?'

তুমি সামান্য হোঁচট খেলে। সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলে না।

—'আপনাদের দিনগুলো কি ভয়ংকর ছিল তাই না ?'

—'হুঁ।' তুমি প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইছ,—'ওসব ছেলেমানুষির কথা বাদ দাও। তুমি কী ভালবাস বলো তো ?'

—'বই পড়তে।' খোকনের দ্রুত উত্তর,—'লিটারেচার, হিস্ট্রি। কবিতা। আপনিও তো খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারেন, তাই না ?'

—'তোমার মা একথাও বলেছে বুঝি ?' তোমার গলায় হাল্কা লজ্জা এল,—'আর কি বলেছে ?'

—'তেমন কিছু না। এই যেমন আপনি, মিহির হালদার, প্রেসিডেন্সির বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। থার্ড হয়েছিলেন হায়ার সেকেণ্ডারিতে।' এবার বিস্ময়ে তোমার মুখ হ্যাঁ। আশ্চর্য! শ্রবণা তোমার নাম ওর কাছে পাল্টে বলেছে কেন ? অর্ণব মুখার্জি নামটা পুরোপুরি মুছে ফেলতে চায় জীবন থেকে ? এত ঘেন্না তোমাকে ? এত ঘেন্না ? এত ? গোটা শরীর নাড়িয়ে রাগ আসছে তোমার। রাগ, না বিকর্ষণ ? আর এসো না এখানে অর্ণব! কখ্খনো না। এখানে তোমার জন্য···। ছেলেটা তোমার ভাব পরিবর্তন লক্ষ করছে। তুমি চোয়ালে চোয়াল চেপে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছ,—'আর কি জান ?'

—'আপনি জীবনানন্দ ভালবাসতেন খুব। আমার বাবার মত।' বলতে বলতে কিশোরের চোখে আকাশ নেমে এল,—'আমিও খুব জীবনানন্দ ভালবাসি। সুকান্তও।'

আরে আরে, তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠেছ কেন অর্ণব মুখার্জি ? খোকনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেছ। চোখে শিশুসুলভ কৌতূহল,—'তোমার বাবাকে তুমি দেখেছ ?'

—'না। আমার জন্মের আগেই উনি কোথায় যেন···খোকনের মুখ ম্লান হয়ে এল। —বাইরে বোধহয় একটু একটু মেঘ করেছে। ঘরের ভেতর আলোটা কমে গেছে হঠাৎ। অথবা খোকনের ম্লান বিষাদ খোলা জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সেই বিষাদ ক্রমে গ্রাস করে নিচ্ছে তোমাকেও। অনিচ্ছুক শরীরটাকে ধীরে ধীরে টেনে তুললে। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল এম, ডি অপেক্ষা

করছে ? বারোটায় বলেছ, না হয় চারটেতেই পৌঁছলে। আজ
তোমার সাত খুন মাপ।

—'উঠলেন যে ?'

—'হুঁ।' হাসতে গিয়েও পরিষ্কার হাসি ফুটল না ঠোঁ
—'হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

—'আপনি ভীষণ কাজের লোক, তাই না ? সেদিনও বেশিক্ষ
বসতে পারলেন না…'

খোকন কি বিদ্রূপ করছে ? না না, বড় মায়াবী কিশোর
সরল।

—'ঠিক বলেছ। আমার খুব বিশ্রী দায়দায়িত্ব।' চঞ্চল পা
দরজা অবধি গিয়েও ফিরলে,—'তোমার অ্যাডমিট কার্ড
দিলে না ?'

—'নেবেনই ?' খোকন অবিকল প্রাপ্তবয়স্ক গলায় জিজ্ঞা
করল। হাতের চাপে হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে কাঠের র‍্যাকের দি
যাচ্ছে। প্লাস্টিকের প্যাকেট থেকে কাগজটা বার করল, —'জের
কপি দিলাম। অসুবিধে নেই তো ?'

ঈশ্বর। ঈশ্বর। ঈশ্বর। প্রবেশ পত্রটি খুলে নিষ্পলক হয়ে গেছ
ভেতরের চাপা কষ্টটা খাঁচা ভেঙে ছিটকে আসতে চাইছে। ঠকঠ
করে কাঁপছে দুটো হাত।……অনির্বাণ মুখার্জি……সান অফ
অর্ণব কান্তি মুখার্জি……ছেলেটাকে হতভম্ব করে দিয়ে রাস্ত
ছিটকে এসেছ তুমি।

৬

রাজকন্যা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে, ধরাতলে রূপসী
সবাকার চেয়ে। …এছাড়া মায়াদর্পণ অন্য কথা বলতে পারে
অর্ণব। পরপর তিন রাত্রি বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফির
জর্জরিত হলে রাকার প্রশ্নের ঝাপটায় তবুও দিল্লির ফ্লাইটটা ছে
দিতে হল। আয়নাটাকে হাজার আছাড় মারলেও ঠিক তা
প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, তাই না ? সত্যের প্রতিচ্ছবি। বেশ তো ছিলে
স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলে তরতর। কী কুক্ষণে যে দেখা

তাকাতে নেই। তাকিয়েছ কি ব্যাস। একশটা অক্টোপাসে পা কামড়ে ধরবে। উজান স্রোতে ভেসে থাকা যে কী কঠিন! গাড্ডায় পড়ে ফরিদাবাদ মাথায়। রিজন্—অর্ণব মুখার্জি ইজ্ সীক্। নিজের কানে শোন কথাটা—অর্ণব মুখার্জি ইজ্ সীক্। চাকরি জীবনে এই প্রথম! অথবা শুধু বলতে পারো। তোমাকে দেখে রাকা কিন্তু সত্যিই ঘাবড়ে গেছে। একা একা বারে বসে আগে ড্রিংক করতে না তো কোনদিন। কী হাল করেছ নিজের। করমচা-লাল চোখের নিচে দু-তিন পোঁচ কালি, চুল-উসকো খুসকো, ঠোঁটে সিগারেট। ব্যালকনিতে যখন তখন বসে আছ নিঝুম! এই নিয়ে সকাল থেকে মগ তিনেক ব্ল্যাক কফি দিল রঘু তবু হ্যাঙওভার কাটে কই! বেতের দোলনা-চেয়ারে শরীর দুলছে নিজের খেয়ালে, আপন গতিতে ছুটছে মন······ফরিদাবাদে যদি চলে যেতেই হয়··· খোকনকে কি ফেলে······শ্রবণা কী ভাবে······মার্কশীটটাকে ঠিক করা······একটা ভাল নিউরোলজিস্ট যদি······ডক্টর লাহিড়ি বা ডক্টর গোস্বামি······! নিজের মধ্যে ডুবে থাকলে বাইরের পৃথিবীটাই বুঝি কোন মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই বোধহয় দেখতে পাচ্ছ না রাকাকে! মেয়েটা স্থির তাকিয়ে তোমার দিকে। অনন্তকাল! চোখমুখে থমথমে অভিমান।

—'তুমি আজও বেরোবে না?'

—'উঁ?'

—'জিজ্ঞাসা করছি আজও কি অফিস বাতিল?'

—'কেন?' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। শব্দটার কোন অর্থ হয় না! রাকা শান দেওয়া চোখে তোমাকে একবার জরিপ করে চলে গেছে রেলিঙ-এর ধারে। গ্রীল আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দৃষ্টি দূরের পার্কটার দিকে। স্বচ্ছ নাইলনের নাইটির আড়ালে ফুলের মত ফুটে রয়েছে ওর মোম শরীর। ফোলা ঠোঁটে রাকাকে কেমন খুকি-খুকি দেখায়। কয়েক পলক সেইদিকে তাকিয়ে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে,—'বেরোতে পারি। কেন?'

রাকা তাকাল না। তুমি আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছ। কদিন ধরে বড় বেশি ধূমপান হয়ে যাচ্ছে। তবু যদি নার্ভগুলো বাগে আসে। বেশ কিছুক্ষণ পর রাকা ঘুরে দাঁড়াল। —'তোমার সত্যি

কি হয়েছে বলো তো ? কদিন ধরে পাগলের মত আচরণ করছ কেন ?'

সকাল থেকে আজ মেঘ জমেছে আকাশে। সেই মেঘ যেন নেমে আসছে রাকার চোখে। তোমার কিঞ্চিৎ করুণা হল। নাটকের নায়কের মত স্বগতোক্তি করে উঠলে,—'আমি অ' ফুলি টায়ার্ড রাকো। সিম্পলি এগ্জস্টেড্।'

—'ফর হোয়াট্ ?' রাকা ঝনঝন বেজে উঠেছে।

—'আই ডোন্ট নো। ইনএক্সপ্রেসেবল্। সব কেমন আপসেট হয়ে গেছে।'

রাকা ঠোঁট বেঁকিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করল,—'আমি কি তোমাকে আই মীন ক্যান আই হেল্প ইউ ?'

তুমি মৃদু মাথা দোলালে।

—'তুমি কি অফিসের প্রবলেম নিয়ে....?'

—'নট ফুললি।' দাঁতে বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরেছ তুমি। মুখে দুঃখ আর অনুশোচনার পোজের দোটানা,—'তবে চাকরিটা ভাবছি ছেড়েই দেব।'

—'হোয়াই ?'

—'তুমি বুঝবে না।'

—'খুব বুঝব।' রাকা অধৈর্যভাবে চুল ঝাঁকাল,—'দ্যাখো, ফরিদাবাদ যাওয়াটা মোটেই কোন প্রবলেম না। সেখানে অফিস তোমাকে ফারনিশড বাংলো দেবে। গাড়ি দেবে···হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো বাপ্পাকে নিয়ে একটু অসুবিধে হতে পারে। আমরা চলে গেলে···বাট উই ক্যান পুট হিম অ্যাট এনি গুড স্কুল ইন ডেলহি। কলকাতার থেকে দিল্লি ফার-ফার বেটার।'

—'হয়ত।' দুঃখকে পরাজিত করে অনুশোচনার পোজটা মুখ দখল করে নিচ্ছে তোমার। সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিল নিচের সবুজ লনে,—এতগুলো লোককে ভাতে মেরে···'

—'হেল উইথ ইওর ব্লাডি সেন্টিমেন্টস। তুমি দুনিয়ার সব লোকের ভাত-কাপড়ের ইজারা নিয়ে রাখোনি। তাছাড়া নিজেই তো বলেছ মাস তিনেকের মধ্যে লকআউট-ফকআউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে!'

তুমি দুহাতে মুখ ঢাকলে। রাকা বুঝবে না। বোঝার কোন সঙ্গত কারণও নেই। কিন্তু অর্ণবকান্তি, তুমি কি শুধুই লকআউটের কারণেই মনমরা? নাকি—'মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না। অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।' ঘুমে মদে, বিভ্রমে শ্রবণা আরও বেশি গভীরভাবে ফুটে উঠছে দর্পণে। অ্যাডমিট কার্ডটা দেখার পর থেকেই। কি করবে এখন? শূলে চড়বে নাকি?

—'লীসন্ অর্ণব।' রাকা তোমার গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গলার স্বর ক্রমশ কোমল,—'বী প্র্যাকটিকাল হানি। আজ অফিস জয়েন করে যাও। যদি দিল্লি যেতে হয় তো'…

তুমি আচ্ছন্নের মত উঠে দাঁড়ালে। যান্ত্রিকভাবে সারলে স্নান, খাওয়া, পোশাকপরা। নেশাগ্রস্তের মত দরজা খুলে নেমে এলে নিচে। গাড়িতে স্টার্ট দিলে। নিশিপাওয়া মানুষের মত পৌঁছে গেলে অফিস নয়, শ্রবণার গলির মুখে।

দরজা খুলে একটুও অবাক হয়নি শ্রবণা। শ্রবণা বোধহয় অবাক হতে ভুলে গেছে। নাকি জানত তুমি আসবে। নির্লিপ্ত গলায় ডাকল,—'এসো।'

হঠাৎ আবেগে ছুটে এসে তুমি হাঁসফাঁস করছ। ঘামে ভিজে ডবল্‌বুল শার্ট লেপটে গেছে গায়ে। দরজা ধরে কয়েক সেকেন্ড আবেগ সামলালে। শ্রবণা ঘরের জানলাটা খুলে দিচ্ছে। ছিটের পর্দা টান-টান করে দিল। বাইরের ভারী আকাশ এবার গুমোট ছড়াতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এক্ষুনি জোরে বৃষ্টি আসা দরকার। শ্রবণা চেয়ার টেনে দিল,—'বোসো।'

তুমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলে,—'খোকন কই?'

শ্রবণা মরালীর মত ঘাড় ঘোরাল। আগের দিনের তুলনায় আজ অনেক সতেজ, সুন্দর। লালপাড় তাঁতের শাড়ি শরীরে আলগা জড়ানো, পিঠের ওপর খোলা চুল। মনে হয় একটু আগে স্নান করেছে। গা থেকে একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ উঠছে। তেল কিম্বা সাবানের। অথবা পরিপূর্ণ নারীর।

—'আমি আগে দুদিন এসেছি।'

—'জানি। খোকন বলেছে।' শ্রবণা হাত দেখিয়ে তোমাকে আবার বসতে বলল।

—'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।' বাক্যটুকু বলতে গিয়ে তুমি তিনবার তোতলালে। কী রিডিকিউলাস অবস্থা। লেবাররলিডারদের গড়গড় করে বক্তৃতা দিয়ে শেষে···।

শ্রবণার স্বর শান্ত,—আমারও।

তুমি কথার ফাঁকে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছ। ভেতরের ঘরটাতেও আলগোছে উঁকি দিলে, 'খোকন নেই?'

—'না। সপ্তাহে দু'দিন ওকে একটা ফিজিওথেরাপী সেণ্টারে যেতে হয়। কাছেই। সরলাদির সঙ্গে।' শ্রবণা টেবিল ফ্যানটা জোর করে দিচ্ছে,—'কিছু হবে না জানি। তবু চেষ্টা···'

—'আমি সে কথাই বলতে এসেছি।' সহজেই কথাটা পেড়ে ফেলতে পেরে তোমার বেশ ফুরফুরে লাগল নিজেকে,—'খোকনের একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

—'কিসের?'

—'আমি ভাল নিউরোলজিস্টকে দেখাতে চাই। ইনফ্যাক্ট, দুজন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথাও বলেছি। খোকনকে নিয়ে যেতে হবে।'

শ্রবণা কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে খোকনের বইপত্র গোছাচ্ছে। পিছন ফিরে। মনে পড়ে চাম্পাহাটিতে সেদিন ঠিক এভাবেই দেওয়ালের দিকে ফিরে চোখের জল গোপন করছিল শ্রবণা? তোমার মা খবর নিয়ে এসেছেন বাবা ভয়ানক অসুস্থ! হার্ট অ্যাটাক্। তোমাক দেখতে চান। তুমি মার মুখে দেখেই ধরে ফেলেছিলে খবরটা মিথ্যে। তোমার মা কোনদিনই দৃঢ়ভাবে মিথ্যে কথা বলতে পারতেন না। সেটা শ্রবণাও বুঝেছিল। তাতে অবশ্য তোমার ফেরা আটকায় নি। আসবার সময় শ্রবণার পিঠে হাত রেখেছিল—সাবধানে থেকো। পারলে ফিরে গিয়েই এল সির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। খবর না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে কোথাও যেও না। তারপর শ্রবণা কোথায় গিয়েছিল? কিভাবে ধরা পড়ে গেল? আজও কি কাঁদছে শ্রবণা? আশপাশের ঘর থেকে নানারকম কোলাহল ছুটে আসছে। এ বাড়ির একতলায় শ্রবণারা ছাড়াও আরও দু' ঘর ভাড়াটে। তোমার খুব ইচ্ছে করছে

সেদিনের মত শ্রবণার পিঠে হাত রাখতে। দাঁড়িয়ে উঠেও বসে পড়লে,—'তুমি উত্তর দিচ্ছ না। তোমার আপত্তি আছে?'

'যদি বলি আছে?' শ্রবণা ফিরল।

—'কেন?'

শ্রবণার চিবুক শক্ত হচ্ছে! জেদ কিম্বা অভিমান গোপন করা চেষ্টা করলে ঠিক এরকম ভাঁজ পড়ত চিবুকে,—'আমার ছেলের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারি।'

—'তা তো পারোই। এতদিন তো একা একাই লড়াই করেছ। আজ যদি আমি একটু কিছুও করতে পারি…'

—'পার কি?' শ্রবণা অদ্ভুত হাসল। হাসিতে বিদ্রূপ? না প্রত্যাখান? তোমার এবার একটু একটু রাগ হচ্ছে। নিজেকে সামলাও অর্ণব। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছ।

ভেতরের ঘরটার পরে বোধহয় রান্নাঘর। সেখান থেকে আচমকা প্রেসার কুকার হুইসিল দিয়ে উঠল। শ্রবণা চমকেছে,—'এক সেকেণ্ড। নামিয়ে আসছি, বলতে বলতে দৌড়ে ভেতরে গেছে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করছে,—'চা খাবে? বসাব?'

তুমি নিরুত্তর। শক্ত হয়ে বসে আছ। মাঝে মাঝে অস্থির হাতে নাড়াচাড়া করছ খবরের কাগজটা। শ্রবণা ফিরে এল,—'বললেন না চা খাবে কি না?'

—'না। তুমি আমার সামনে এসে বোসো।'

শ্রবণা মোড়া টানল। ফার্স্ট পয়েণ্ট, সেকেণ্ড পয়েণ্ট, থার্ড এভাবে না বলতে পারলে তোমার বোধহয় অসুবিধা হয়। তাই বুঝি গলা কেঁপে গেল,—'তুমি কি এখনও ইয়ে মানে রাজনীতি করো?'

শ্রবণা হাসল।—'এখনও মানে? রাজনীতি করতাম কবে?'

উত্তরটার মানে কি? তোমার চোখে প্রশ্ন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছ।

—'আমি রাজনীতি করতাম না অর্ণব। আমার কিছু বিশ্বাস ছিল। সমাজ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে। এখনও আছে।'

—'তা ঠিক।' তুমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলে,—হ্যাঁ, রাজনীতি মানেই তো ধান্দাবাজি। মরে শুধু বোকারা।' বলতে বলতে ঈষৎ

উত্তেজিত,—'সতেরো বছর আগেও মরেছে। এদেশে কমিউনিজমের নামে……'

তোমাকে মাঝ পথে থামাল শ্রবণা,—'এটা বোধহয় তোমার বিষয় নয় অপূর্ব। তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে এসব বিচার করা যায় না। তোমার সে অধিকারও নেই।'

নতুন করে ম্রিয়মান হচ্ছে। শ্রবণা এভাবে কথা বলছে কেন? কিছুতেই কি বিশ্বাস করানো যায় না তুমি ওর পাশে দাঁড়াতে চাও? কয়েক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইল ওর দিকে। এই সেই মেয়ে। তোমার প্রেমের, তোমার স্বপ্নের, হীনমণ্যতাবোধের শ্রবণা। রাগ ক্রমে যন্ত্রণা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। গভীরে। আরো গভীরে। অকস্মাৎ শ্রবণার হাত চেপে ধরেছ,—'আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব খারাপ তাই না?'

শ্রবণা হাত ছাড়াল না। উল্টে অন্য হাতটা রাখল তোমার হাতের ওপর,—'দূর পাগল। তুমি খারাপ হবে কেন? তুমি তোমার মতন।'

শ্রবণার স্পর্শে তোমার সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে যাচ্ছে। কাতরভাবে বলে উঠলে,—'বিশ্বাস করো, আমি কোন খবর জানতাম না। অনেক চেষ্টা করেও কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারি নি। সত্যি বলছি। তোমাকে হঠাৎ সেদিন দেখে……'

শ্রবণার গলা কাঁপছে এবার,—'মানুষ পরিস্থিতির দাস। তুমি, আমি, সব্বাই। আমার কোন অভিযোগ নেই।'

—'তবে তুমি সাহায্য নেবে না কেন?'

তোমার সামনে নারী মূর্তি আবার নীরব। হাতটা আলতো করে সরিয়ে নিচ্ছে। মোড়া থেকে উঠে জানলার ধারে গেল।

—'তোমার মনে পড়ে অপূর্ব, তুমি একদিন নিজের হাতে মানিকতলার দুজন ডাক্তারকে ধমক দিয়ে চিঠি লিখেছিলে। তারা বেশি ফীজ্ নিত। তোমার স্পেশালিস্টদের ফীজ্ কি তার থেকে কম?'

কথাটা বুঝি সপাং করে বাজল তোমার পিঠে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছ।—খোকনের মার্কশীট তুমি কি ভাবে ঠিক করবে? বোর্ডের অফিসারকে মদ খাইয়ে? না ঘুষ?'

অসহ্য। একটা আদিম পশু আচমকা গর্জন করে উঠল তোমার ভেতর থেকে। নীল—'রক্তে যেন আগুন ধরে গেল,—'চুউউপ করো। এতই যদি তোমার নীতিবোধ ছেলের বাবা হিসেবে আমার নাম রেখেছ কেন? এত ঘেন্না আমাকে যে ছেলের কাছে আমার নামে বলো মিহির হালদার? তোমার লজ্জা করে না?'

শ্রবণা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছে ভুরু। জানলার ধার থেকে ফিরে আসছে। মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। মানবী নয়, যেন ধারালো জমাট বরফ,—'তা অবশ্য ঠিক। বাবা হিসেবে তোমার নাম না দিয়ে সেই পুলিশের লোকগুলোর নাম দিলেও আমার চোখে কোন তফাত হত না, কিম্বা কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের। বা কোন মন্ত্রীর। বা তোমাদের সমাজের যে কোন লোকের। খোকন তো তোমাদেরই ছেলে। তোমাদের সমাজের।'

চাবুকটা বুঝি তোমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে এবার রক্তাক্ত করবেই। তীব্র যন্ত্রণায় মুখ চোখ কুঁচকে গেছে তোমার। মাথার চুল খামচে ধরে আবার বসে পড়েছ। বসেই আছ। দুঃসহ কিছু মুহূর্ত। তারপর আবার শ্রবণার স্পর্শ তোমার মাথায়, 'রাগ কোরো না। তোমার নামটা আমার জীবনে একমাত্র দুর্বলতার ছাপ। আমার ছেলের চোখে তার বাবা একটা আদর্শ। আমি চাইনি তোমাকে দেখে তা ভেঙে যাক্।'

তোমার চোখ জ্বালা করছে। শেষে কেঁদেই ফেলবে নাকি! ট্রাজিক হিরোর মত! হ্যামলেট রি-ইন্‌কারনেটেড! ওঠো। সাহস আনো। চোখে চোখে তাকাবার চেষ্টা করো শ্রবণার। পারছ না কিছুতেই? শ্রবণার চোখ কিন্তু তোমার মুখে স্থির। ও তোমাকে চিনতে পেরেছে। শেষবারের মত ওর গলার আওয়াজ ধাক্কা মারছে তোমাকে,—'তুমি কেন আমাকে দেখতে পেলে অর্ণব? …তুমি আর এসো না!'

মাথা নিচু করে বসে আছ। এতক্ষণ পর তুমুল বৃষ্টি নেমেছে বাইরে।

৫

তোমার চেম্বারের রঙ অফ-হোয়াইট। পর্দার রঙ কচি কলাপাতা। টেলিফোন লাল, সাদা, বাদামী। টেবিল ঝকঝকে ওয়ালনাট। জামা ফিকে গোলাপি। কিন্তু এর মধ্যে একটা রঙও যে তোমার নিজের নয় হে, অর্ণবকান্তি! তবে কি শ্রবণার দেওয়া ওই চাবুকের দাগগুলোতেই রয়েছে তোমার প্রকৃত রঙ। নিশ্চয়ই তাই। নইলে দরজার বাইরে লালবাতি জ্বালিয়ে নির্জন ঘরে ছটফট করে ঘরো? কী খোঁজো? প্রত্যাবর্তনের সুড়ঙ্গপথ! নিজের চেয়ারে দু সেকেণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারছ না। আহত সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছ। হুড় মুড় ছুটে গেলে জানলার সামনে। দুহাতে সজোরে সরিয়ে দিচ্ছ ভারী পর্দা। পরমুহূর্তে টেনে ঢেকে দিয়েছ জানলাটাকে; টেবিলটাকে হন হন পাক খেলে কয়েকবার। একবার চেয়ারের হাতলেও বসবার চেষ্টা করলে। পেপারওয়েটগুলো লাট্টুর মত ঘোরাচ্ছ! একি, ওটা হাতে তুলে নিয়েছ কেন? সর্বনাশ! দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে নাকি? নিজের ভেতর এ কী বিপন্ন অস্থিরতা! 'অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত প্রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত'—চাবুকটা খুব জোর পড়েছে হে। টয়লেটে ঢুকে আয়নায় কি দেখ তন্ন তন্ন করে? হৃৎপিণ্ডের দাগ আয়নায় ফোটে না। চকচকে সবুজে গালটাকে বুড়ো আঙুলে ঘসছ চেপে চেপে। ফর গড'স্ সেক্, একটু সংযত হও। কি ভাবছ দাঁতে দাঁত চেপে? চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়! ওফ্, সেই উন্মাদনার দিনগুলো! ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেও কী সাংঘাতিক ভাবে জ্যান্ত ছিলে! ভুল দিন। তবু দিন তো। পৃথকভাবে দিন। শুধু চব্বিশটা যান্ত্রিক ঘণ্টা নয়। আরে আরে, এত তন্ময় হয়ে গেছ কেন? ফোনটা যে বেজেই চলেছে। তাকাও। এই তো বেশ ফিরছ পিছলে পিছলে। টেবিলের দিকে। তোলই না। ভয় কি?

—'কি মুখার্জি, সাড়া নেই কেন? এগেইন্ ফিলিং সীক্?'

এম-ডির গলা যেন গলা নয়, সাপুড়ের বাঁশী। ধীরে ধীরে বশ হয়ে যাচ্ছে ছটফটে সাপটা। প্রথমে স্থির হল। তারপর ফণা দোলাচ্ছে,—'নো স্যার। আয়াম ফাইন।'

—'দেন গেট রেডি ফর আ বিগ সারপ্রাইজ্‌! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানতে পারবে।'

শঙ্খচূড়ের ফণা থরথর কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই একটা লিফ্‌ট্‌। আরও একধাপ।

—'তোমার হাতের কাজ শেষ হলে আমার ঘরে একবার চলে এসো। লেবাররা ক'দিন ধরে কারখানার সামনে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ডিস সাউথের সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার।'

—'যাচ্ছি স্যার। এখ্‌খুনি।'

এম ডির ফোন যেন চাপ দিয়ে দিয়ে বিষটা বার করে নিল। ঝরে যাচ্ছে টপটপ, টপটপ। সাপ চেয়ারে নেতিয়ে পড়ছে। অভিনন্দন মুখার্জি সাহেব। ওয়ান মোর ফেদার টু ইওর লরেল। সাপটা আবার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিমায় খেলা দেখাতে পারবে! নো ফোঁস-ফোঁসানি। নো ছোবল। নিজেকে ছাড়া। কুরুভিলা আগেই বলেছিল, হোয়েন ইউ ড্রিংক মুখার্জি, ইউ স্মেল মার্কসিস্ট্‌। কুরুভিলাটাও কি চাবুক চালাতে জানে? এখন অত ভাবার সময় নেই। ইঁদুরটা এখন আবার দৌড়ের জন্য প্রস্তুত। টাই-এর নটটা ভাল করে বেঁধে নিচ্ছে গলায়।

এই-ই ভাল। শ্রবণারা তবে আসুক তোমার মধ্যরাত্রের স্বপ্নে, জাগরণে। অথবা ব্লাডিমেরীর গেলাসে। বুদ্বুদের মতন।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books